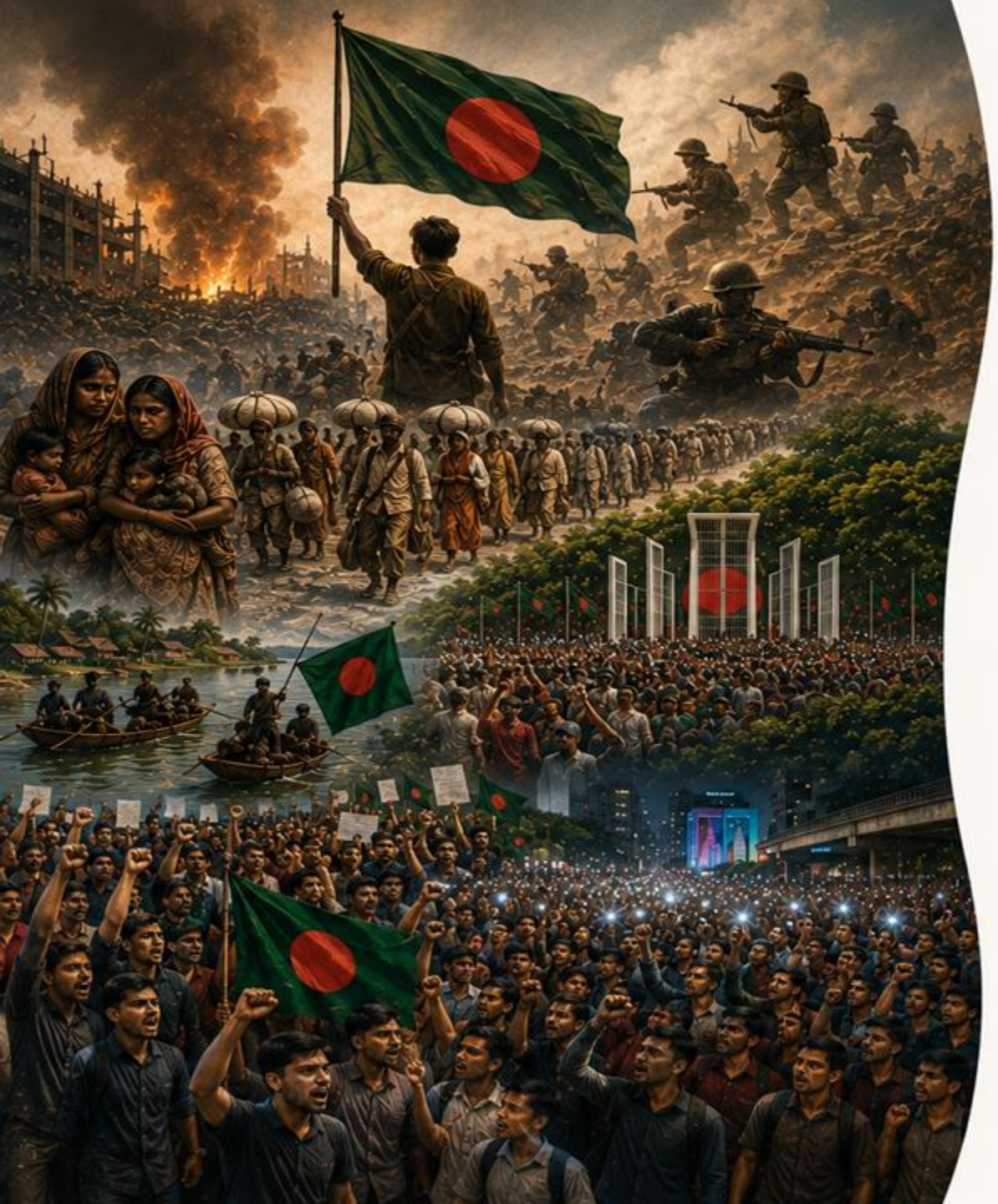

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ সাল পর্যন্ত

Liberation Movement of 1971 and Mass Uprising Till 2024

ভূমিকা

- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা।
- জনগণের আন্দোলন, নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যা, প্রতিরোধ ও মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম জাতির মনোবলকে দৃঢ় করে।
- স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও জাতীয় পরিচয় গঠনের সংকট দেখা দেয়।
- ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকের আন্দোলন এবং ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলন ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে তা নতুন মাত্রা পায়।

পাকিস্তান সৃষ্টি

লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতিতত্ত্ব

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পৃথক আবাসভূমির দাবি এবং জিন্না'র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দানা বাঁধে।

মন্ত্রিমিশন ও ৩ জুনের পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশন এবং ১৯৪৭ সালের লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুনের পরিকল্পনার আলোকেই ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম

১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাসের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দীর্ঘ ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো ও বৈষম্য

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ছিল ১,২০০ মাইলের বেশি। মধ্যিখানে ছিল বিশাল ভারতীয় ভূখণ্ড, যা একটি অস্বাভাবিক ভৌগোলিক কাঠামো।

জনসংখ্যা বনাম আয়তন

পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন মাত্র ১৫.৭% হলেও জনসংখ্যার ৫৬.৩% ছিল এখানে। অথচ সব প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করত পশ্চিম পাকিস্তান।

প্রশাসনিক ও মানবিক সংকট

নতুন রাজধানী ও সচিবালয় নির্মাণে পশ্চিমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রায় ৭২ লক্ষ রিফুজি সমস্যা ও প্রশাসনিক ফাইলপত্র হারানোয় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব

সিভিল সার্ভিসে বৈষম্য

১৯৫৫ সালে ১৯ জন সচিবের মধ্যে একজনও বাঙালি ছিল না। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে ৮৪% পশ্চিম পাকিস্তানি এবং মাত্র ১৬% বাঙালি কর্মকর্তা ছিল।

প্রতিরক্ষা ও সামরিক বৈষম্য

১৯৬৬ সালে অফিসার পদে মাত্র ৫% বাঙালি ছিল। নৌ ও বিমান বাহিনীতেও বাঙালির সংখ্যা ছিল নগণ্য। পূর্বাঞ্চল ছিল অরক্ষিত।

রাজনৈতিক দমন ও সামরিক শাসন

আইয়ুব খানের ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। বাঙালিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অস্ত্রের মুখে দমানো হয়।

রাজনৈতিক বৈষম্য

প্রতিনিধিত্বের অভাব: গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। ২৪ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর বাঙালিরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

সংবিধান ও গণতন্ত্র: গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব এবং স্বৈরাচারী মনোভাবের কারণে প্রথম সংবিধান প্রণয়নে ৯ বছর সময়ক্ষেপণ করা হয় এবং সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করা হয়।

নেতৃবৃন্দের দমন: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয় মেনে না নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয়। এছাড়া শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বাঙালি নেতাদের আগরতলা মামলার মতো দমনমূলক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়।

প্রশাসনিক ও বৈদেশিক মিশন: প্রশাসনে এবং বিদেশে পাকিস্তান মিশনের উচ্চপদে বাঙালিদের নিয়োগের হার ছিল মাত্র ১৫% এবং ৮৫% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পরিকল্পনায় বৈষম্য: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হয়েছিল মাত্র ৩৭% পুঁজি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ২৩% বৃদ্ধি পায়।

সম্পদ পাচার ও রাজস্ব বৈষম্য: পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত রাজস্বের তুলনায় ব্যয়ের হার ছিল কম। ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর পশ্চিমে হওয়ায় আয়কর ও শুল্কের বড় অংশ সেখানেই জমা হতো।

বৈদেশিক সাহায্যের বঞ্চনা: আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় করা হলেও, ঋণের দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে।

অবকাঠামোগত বৈষম্য: ১৯৬০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিম পাকিস্তানে রেলপথ ছিল ৫,৩৪৩ মাইল এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১,৭১২ মাইল; যা স্পষ্ট অবকাঠামোগত বৈষম্যের প্রমাণ।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতীকী চিত্র

সামাজিক বৈষম্য

- **বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ:** নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি রাখা হতো (যেমন: ১৯৬৬ সালে চালের দাম পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৫০ টাকা, যেখানে পশ্চিমে ছিল ১৮ টাকা)।
- **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য:** অশিক্ষিত রেখে শাসন পাকাপোক্ত করতে সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করত। ১৯৬২-'৬৩ অর্থবছরে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ২০৩.১ কোটি রুপি, বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৭৬.৫ কোটি রুপি।
- **গবেষণা ও বৃত্তি:** বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বরাদ্দকৃত অর্থের ৮০% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সরকারি বৃত্তির সিংহভাগই পেতেন পশ্চিম পাকিস্তানি শিক্ষার্থীরা।
- **স্বাস্থ্যসেবা:** পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত; যেমন—পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬,০০০ হাসপাতালের বেড থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৬,০০০।

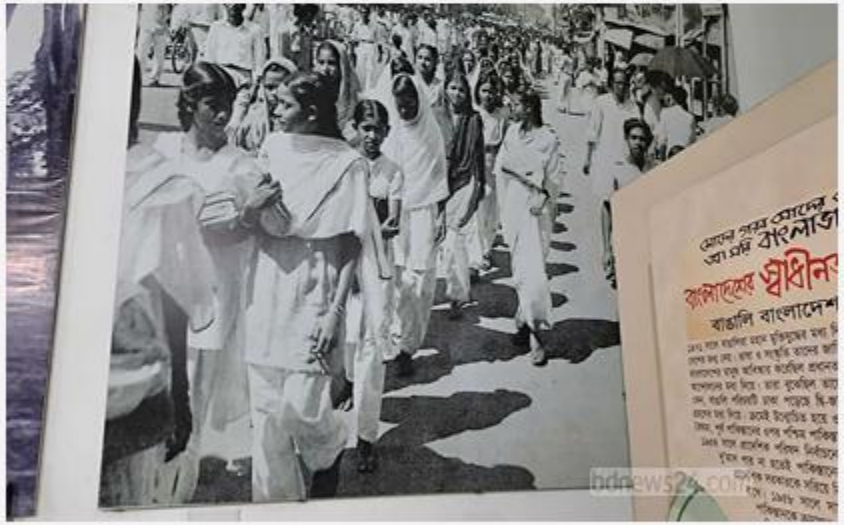

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

- **সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া:** বাঙালিদের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর উর্দু সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল।
- **ভাষা আন্দোলন:** ১৯৪৮ সালে মাত্র ৭% মানুষের ভাষা 'উর্দু'-কে ৫৬% বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার হীন চক্রান্ত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে নস্যাৎ করা হয়।
- **নিষেধাজ্ঞা:** ১৯৬৭ সালে আইয়ুব সরকার রবীন্দ্রসংগীত এবং বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর সরাসরি আঘাত হানে।
- **অবকাঠামোগত অভাব:** বিনোদন ও খেলাধুলার ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রকট ছিল; পূর্ব পাকিস্তানে ভালো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিশুপার্ক এবং খেলার মাঠের অভাব ছিল, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে এর চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা ছিল।

৬-দফার গঠন

- **১ম দফা:** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গঠন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম আইনসভা প্রতিষ্ঠা।
- **২য় দফা:** কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি থাকবে, বাকি সকল ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে।
- **৩য় দফা:** মুদ্রা পাচার রোধে দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক অথবা একই মুদ্রা চালু রেখে কার্যকর রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- **৪র্থ দফা:** সকল প্রকার কর, খাজনা ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
- **৫ম দফা:** দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ট্রেডমিশন স্থাপনের অধিকার থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে।
- **৬ষ্ঠ দফা:** জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সংহতি রক্ষায় প্রদেশগুলোকে নিজস্ব আধাসামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬-দফা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

- **পাকিস্তান সরকার:** সরকার ৬-দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দেয়। আইয়ুব খান একে 'হিন্দু আধিপত্যাধীন যুক্তবাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র' বলে মন্তব্য করেন এবং সামরিক অভিযানের হুমকি দেন।
- **রাজনৈতিক দলসমূহ:** পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ৬-দফার সমালোচনা করে এবং একে দেশবিভাগের ফর্মুলা বলে অভিহিত করে। ধর্মীয় দলগুলোর দাবি ছিল ৬-দফা ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে।
- **পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান:** পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এই কর্মসূচিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন। তবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের একাংশ এটিকে অসম্পূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং পাল্টা ১৮-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।
- **অন্যান্য নেতৃবৃন্দ:** নূরুল আমীন এবং আতাউর রহমান খানের মতো বিরোধী দলীয় নেতারাও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৬-দফার গুরুত্ব

- **জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা:** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ৬-দফা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় এবং এর পরিপূর্ণতা দান করে।
- **মুক্তির সনদ:** এটি ছিল শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং বাংলার আপামর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ।
- **স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা:** ৬-দফা কেবল স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল না, বরং এই দাবিগুলোই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।
- **ঐক্যবদ্ধ চেতনা:** শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬-দফার মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি জাতি একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাবোধে জাগ্রত হয়, যা পাকিস্তান সরকারের দমননীতিকে ব্যর্থ করে দেয়।
- **নির্বাচনী ভিত্তি:** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬-দফাকে ইশতেহার হিসেবে প্রচার করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, যা বাঙালি জাতীয়তাবোধকে চূড়ান্ত পরিণতি দান করে।

আগরতলা মামলার প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু

- **প্রেক্ষাপট:** স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান ৬-দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করতে এই কূটকৌশল অবলম্বন করেন।
- **মামলার ধরণ:** ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়, যা দাপ্তরিকভাবে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য' নামে পরিচিত।
- **অভিযোগ:** মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।
- **প্রহসন:** এই মামলার ভিত্তি তৈরি করতে পাকিস্তান সরকার প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিল এবং পরবর্তীতে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত অনেক দলিলই তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

আগরতলা মামলার আসামিদের তালিকা

প্রধান আসামি: শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আসামি: লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল), আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি (ঢাকা), জনাব রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (খুলনা), এবং সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)।

পেশাজীবী ও সামরিক ব্যক্তিবর্গ: মামলার তালিকায় আরও ছিলেন স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান, সিডিআই নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফিজউল্লাহ, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, মেজর শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন এ শওকত আলী, লে. এম. মতিউর রহমানসহ মোট ৩৫ জন।

আইনি প্রক্রিয়া: আসামিদের প্রথমে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল, পরে ১৮ জানুয়ারি তাদের আর্মি, নেভি অ্যান্ড এয়ারফোর্স অ্যাক্ট-এ গ্রেফতার দেখিয়ে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তর করা হয়।

বিশেষ ট্রাইবুনাল ও গণঅভ্যুত্থান

- **বিচার:** ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলার শুনানি শুরু হয়।
- **আইনি লড়াই:** আসামিদের পক্ষে লড়েছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামসহ দেশি-বিদেশি একদল অভিজ্ঞ আইনজীবী।
- **গণআন্দোলন:** মামলার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার উত্তাল প্রতিবাদ শুরু হয়। এই সময়ে আসাদুজ্জামান, সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যার ঘটনায় পুরো পূর্ব পাকিস্তান অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।
- **বিজয়:** প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

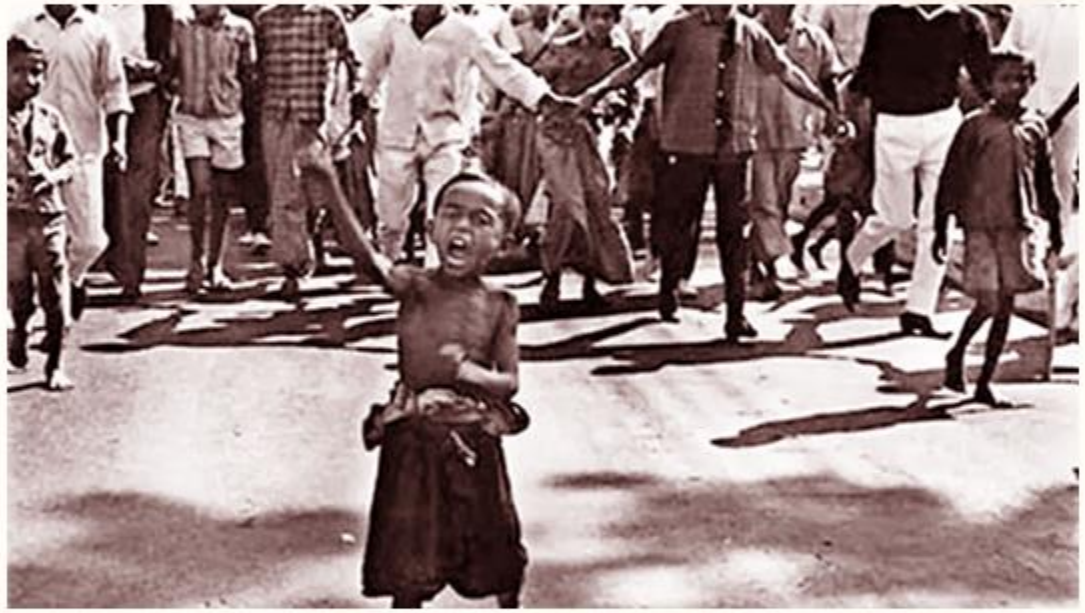

আগরতলা মামলার ফলাফল ও গুরুত্ব

জনপ্রিয়তা: মামলাটি শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে।

গণসচেতনতা ও ঐক্য: মামলার কার্যক্রমগুলো পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রচার হওয়ায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়, যা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেয়।

আইয়ুব খানের পতন: এই মামলার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলন আইয়ুব খানের শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করে।

৭০-এর নির্বাচন ও স্বাধীনতা: মামলার প্রভাব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এই আন্দোলনের পথ ধরেই পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি ও পর্যায়ক্রম

গণঅভ্যুত্থানের বিবর্তন:

পটভূমি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দিদশা এবং আইয়ুব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ক্ষোভ থেকে আন্দোলনের সূত্রপাত।

সংগ্রামের ৩টি পর্যায়:

- প্রথম পর্যায় (৪-১৯ জানুয়ারি): সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ১১-দফা দাবি উত্থাপন। 'ডাক' (DAC) গঠন ও ৮-দফা কর্মসূচি ঘোষণা।
- দ্বিতীয় পর্যায় (২০ জানুয়ারি-২২ ফেব্রুয়ারি): আসাদ, মতিউর ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবশেষে আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার ও বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।
- তৃতীয় পর্যায় (২৩ ফেব্রুয়ারি-২৫ মার্চ): গোলটেবিল বৈঠক, আইয়ুব খানের শাসনের ব্যর্থতা এবং ২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল

অভ্যুত্থানের কারণ ও প্রভাব:

প্রধান কারণসমূহ:

- অর্থনৈতিক: দুই অঞ্চলের চরম বৈষম্য এবং সম্পদ পাচার।
- রাজনৈতিক: গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, মৌলিক গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।
- সামাজিক: দুর্নীতির প্রসার, আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্য ও মৌলিক গণতন্ত্রীদের অত্যাচার।

ফলাফল:

- আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি।
- আইয়ুব খানের পতন ও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিদায়।
- ৭০-এর নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হওয়া।
- বাঙালি জাতীয়তাবোধের চরম বিকাশ ও স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা।

১১-দফা কর্মসূচির গুরুত্ব

১১-দফার প্রভাব:

- **রাজনৈতিক যোগসূত্র**: ৬-দফার সাথে ১১-দফার সংমিশ্রণ রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজের মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য তৈরি করে।
- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি**: এই কর্মসূচি কেবল স্বায়ত্তশাসন নয়, বরং কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ (কর হ্রাস, মজুরি বৃদ্ধি, শিল্প জাতীয়করণ) রক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- **সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত**: সর্বস্তরে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে।
- **স্বাধীনতার বীজ**: এই আন্দোলনের মাধ্যমেই মূলত স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা ও স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল, যা পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন।

- ৭ ডিসেম্বর: জাতীয় পরিষদের নির্বাচন।
- ১৭ ডিসেম্বর: প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন।
- আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

নির্বাচনী পরিবেশ

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে। প্রধান দলগুলো ছিল মূলত আঞ্চলিক:

- পূর্ব পাকিস্তান: আওয়ামী লীগ (জনপ্রিয়)।
- পাঞ্জাব ও সিন্ধু: পিপলস পার্টি (ভুট্টো)।
- বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ: ন্যাপ (ওয়ালী)।

আওয়ামী লীগের ইশতাহার

৬-দফা ও ১১-দফা

শেখ মুজিবুর রহমান নৌকা প্রতীকের পক্ষে ব্যাপক প্রচার চালান। তার মূল লক্ষ্য ছিল:

- আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার।
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে 'জয় বাংলা' স্লোগানের জনপ্রিয়তা।
- শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বাঙালির স্বশাসন প্রতিষ্ঠা।

নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	মহিলা আসন	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০	০৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	০৫	৮৮
অন্যান্য দলসমূহ	০১	০১	৫৮

আওয়ামী লীগের এই বিজয় ছিল ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণরায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক নিরঙ্কুশ বিজয়

ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক জান্তার টালবাহানা

গভীর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট

বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত জনবিক্ষোভ

দুর্বার অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা

পটভূমির মূল চালিকাশক্তি

- ✓ আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার প্রত্যয়।
- ✓ ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার গভীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্র।
- ✓ নির্বাচনী রায় বানচাল করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা।
- ✓ বাঙালি জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চনা ও স্বাধিকার আন্দোলন দমন।

অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা

আন্দোলনের তাৎক্ষণিক কারণ

১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চের পূর্বঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা ঘটে।

- আওয়ামী লীগের ৬-দফা ও ছাত্রসমাজের ১১-দফা
- ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান
- ১৩ ফেব্রুয়ারি: ৩ মার্চ ঢাকায় অধিবেশন ঘোষণা
- ১৫ ফেব্রুয়ারি: ভুট্টোর অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতি
- ১ মার্চ: জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ

গুরুত্বপূর্ণ দিনপঞ্জি (মার্চ ১৯৭১)

৩ জানুয়ারি

রেসকোর্স ময়দানে নিরঙ্কুশ বিজয়ী নবনির্বাচিত সদস্যদের ঐতিহাসিক ৬-দফা পালনের শপথ গ্রহণ।

১৩ ফেব্রুয়ারি

জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান।

১ মার্চ

অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত করার ঘোষণা। ক্ষোভে ফেটে পড়ে আপামর ছাত্রজনতা।

২ মার্চ

ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন।

অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল করে বাঙালির নিজস্ব শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা:

অসহযোগ আন্দোলন

- সরকারি অফিসসমূহ
- পুলিশ ও প্রশাসন
- ব্যাংক ও বীমা
- বেতার ও টেলিভিশন
- খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ
- পরিবহণ ও যোগাযোগ
- আদালত ও হাইকোর্ট
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

শাসনতান্ত্রিক অচলবস্থা

২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আন্দোলনের কঠোর নির্দেশিকা ঘোষণা করা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পাকিস্তানি স্বৈরাচারী আদেশ প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শুরু করেন।

- ✓ পাকিস্তানি জান্তার নির্দেশ সম্পূর্ণ অমান্য
- ✓ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রশাসনিক সমান্তরাল শাসন
- ✓ ট্যাক্স-খাজনা বর্জন আন্দোলনের ডাক
- ✓ সর্বাত্মক গণজাগরণ ও মুক্তিচেতনা

৩ মার্চের ঐতিহাসিক ইশতেহার

BD

লক্ষ্য ১: স্বাধীন বাংলা

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন এবং বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান।

লক্ষ্য ২: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

আঞ্চলিক ও ব্যক্তিক বৈষম্য নিরসনকল্পে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা এবং কৃষক-শ্রমিকের অধিকার রক্ষা।

লক্ষ্য ৩: প্রকৃত গণতন্ত্র

ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতাসহ সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

"মুক্তি যদি পেতে চাও, বাঙালিরা এক হও। গ্রামে গ্রামে দুর্গ কর, মুক্তিবাহিনী গঠন কর।"

— ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে পঠিত ঐতিহাসিক ইশতেহার

স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপন্থা

৩ মার্চের ইশতেহার অনুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির সুনির্দিষ্ট রণকৌশল:

🏠 সংগ্রাম কমিটি গঠন

প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলা স্তরে সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন ত্বরান্বিত করা।

🤝 জাতীয় ঐক্য

সব শ্রেণির পেশাজীবী ও জনসাধারণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংহতি স্থাপন করা এবং জাতীয় চেতনা সুসংহত করা।

মুক্তিবাহিনী গঠন

শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে যথাযথভাবে সংগঠিত করে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা।

☮ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি ভেদাভেদ ভুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং অপশক্তি প্রতিরোধ করা।

📞 পারস্পরিক যোগাযোগ

আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

⚖ সামাজিক শৃঙ্খলা

লুটতরাজ ও সর্বপ্রকার সমাজবিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে অহিংস গণআন্দোলন সুশৃঙ্খল রাখা।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

কালজয়ী অমর ঘোষণা

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- ✓ বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল রূপরেখা প্রদান।
- ✓ পাক শাসকচক্রের দীর্ঘ শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি।
- ✓ ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে প্রতিরোধ সংগ্রামের ডাক।
- ✓ একাত্তরের উত্তাল দিনে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

৭ মার্চ – মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্যায় ও সর্বাত্মক প্রস্তুতি

জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রস্তাব

ক্ষমতা হস্তান্তরকে চিরতরে স্তব্ধ করতে পিপিপি প্রধান ভুট্টোর চক্রান্তমূলক প্রস্তাব:

BD শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান

- ✓ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ড শাসন ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে ন্যস্ত করা।
- ✓ নির্বাচনী গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও অবিলম্বে জাতীয় অধিবেশন আহ্বান।
- ✓ বাঙালির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা ৬-দফার বাস্তবায়ন।
- ✓ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনা প্রত্যাহার।

PK জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রস্তাব

- পাকিস্তানের দুই অংশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে আলাদা ক্ষমতা হস্তান্তর।
- একই রাষ্ট্রে দুই পৃথক সরকার ও দুই ভিন্ন প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বের উত্থাপন।
- পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার্থে ৬-দফার চরম বিরোধিতা।
- বাঙালি প্রধানমন্ত্রী মেনে নিতে অস্বীকৃতি এবং ক্ষমতার ভাগাভাগির দাবি।

⚠️ **ভুট্টোর প্রস্তাব ছিল পাকিস্তানের বিভাজন ডেকে আনার চূড়ান্ত নীল-নকশা।**

ফলাফল: এই অগণতান্ত্রিক ও অবাস্তব দাবির ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

⚠ ইয়াহিয়ার কুটিল চক্রান্ত

পূর্ব পাকিস্তানে চলমান সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের নতুন অধিবেশন বসবে এবং এর পূর্বে ১০ মার্চ ঢাকায় সংসদীয় নেতাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

> *"বাঙালির তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমরা সম্মেলনে বসতে পারব না।"*
>
> *— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপসহীন ঘোষণা*

→ প্রত্যাখ্যানের পেছনের কৌশল

- ✓ ১০ মার্চের সম্মেলন প্রস্তাবের আড়ালে ছিল আলোচনার অভিনয়ে সময়ক্ষেপণ করার অপকৌশল।
- ✓ এই আলোচনার সুযোগে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আনা হচ্ছিল।
- ✓ বাঙালির তাজা রক্ত দিয়ে রঞ্জিত রাজপথ মাড়িয়ে কোনো বৈঠকে না বসার দৃঢ় প্রত্যয়।
- ✓ বাঙালির চরম আপসহীনতা ও মুক্তি অর্জনের অদম্য ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

✊ ফলাফল: গণআন্দোলনের তীব্রতা দিন দিন আরও বেগবান হতে থাকে।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি

দেশব্যাপী তীব্র রূপ

৭ মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সকল সরকারি দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ও হাইকোর্ট পাকিস্তানি জান্তার আদেশ উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে।

১৫ মার্চ ১৯৭১: ৩৫টি ঐতিহাসিক নির্দেশ

বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং দেশ পরিচালনার জন্য ৩৫টি ঐতিহাসিক প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করেন।

অকার্যকর পাকিস্তানি প্রশাসন

৭ মার্চ: টিক্কা খানের নিয়োগ

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হলেও তাকে শপথাধীন করতে অস্বীকৃতি জানান প্রধান বিচারপতি।

১৩ মার্চ: রেডিও বয়কট ও তেল নিষেধাজ্ঞা

করোচি বেতার কেন্দ্র থেকে বাঙালি উপস্থাপকদের পদত্যাগ। সামরিক বাহিনীকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ জারি।

১৬-২৪ মার্চ: আলোচনা প্রহসন

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক আসলে ছিল পাকিস্তান থেকে সমরাস্ত্র বোঝাই এমভি সোয়াত্ত জাহাজ ঢাকায় নিয়ে আসার সময়ক্ষেপণের অজুহাত মাত্র।

ভয়াবহ অপারেশন সার্চলাইট

আক্রমণের পূর্বপ্রস্তুতি ও সময়রেখা

১ মার্চের পূর্বে: রংপুর সীমান্ত থেকে ট্যাংক ঢাকায় স্থানান্তর।

১ মার্চ হতে: পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা পরিবার স্থানান্তর।

৩ মার্চ: অস্ত্র বোঝাই পাকিস্তানি জাহাজ এমভি সোয়াত চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর।

১৭ মার্চ: টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলী কর্তৃক অপারেশন সার্চলাইট ব্লুপ্রিন্ট চূড়ান্ত।

২৪ মার্চ: চট্টগ্রাম বন্দরে গোপনে অস্ত্র খালাস শুরু।

২৫ মার্চ রাত: মধ্যরাতে অতর্কিতে ঢাকা শহরে হামলা শুরু।

২৫ মার্চের মূল অমানবিক উদ্দেশ্য

- বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ ও অবদমিত করা।
- স্বাধীনতাকামী সকল ছাত্রজনতা ও জাতীয় আন্দোলনকে চিরতরে ধ্বংস করা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল ছাত্রাবাসে বর্বর গণহত্যা চালানো।
- সামরিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনর্বহাল করা।

২৫ মার্চের নির্মম গণহত্যা

আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু

- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা:** জগন্নাথ হল, ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) এবং শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ।
- **রাজারবাগ পুলিশ লাইনস:** ঘুমন্ত বাঙালি পুলিশ জওয়ানদের উপর অতর্কিত প্রথম সশস্ত্র আক্রমণ।
- **পিলখানা ইপিআর সদর দফতর:** নিরস্ত্র বাঙালি সৈন্যদের উপর ট্যাংক ও মেশিনগানের নির্মম ধ্বংসলীলা।
- **অন্যান্য আক্রান্ত এলাকা:** পুরান ঢাকা, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, মিরপুর, মোহাম্মদপুর এবং দি পিপলস, ইত্তেফাক ও সংবাদ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ।

বর্বরতার শিকার নিরীহ বাঙালি

কোনো ধরনের পূর্ব সঙ্কেত ছাড়া ট্যাঙ্ক, মর্টার, ভারী মেশিনগান নিয়ে ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাতক বাহিনী। মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইনের মতে, ২৫ মার্চ রাতে কেবল ঢাকা শহরেই ৭ সহস্রাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।

> *"বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম নির্মম ও পৈশাচিকতম গণহত্যা।"*
>
> *— একাত্তরের ২৫ মার্চের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের সারকথা*

সার্চলাইটের প্রভাব ও প্রতিরোধ

২৫ মার্চের গণহত্যার নির্মম পরিণতি ও বাঙালির তীব্র পাল্টা প্রতিরোধের রূপরেখা:

২৫ মার্চ রাতে বর্বরোচিত অপারেশন সার্চলাইট ও গণহত্যা

বাঙালির তীব্র প্রতিরোধ ও ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মহান সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত স্বাধীন বিজয় অর্জন

আন্তর্জাতিক অঙ্গন ও প্রতিক্রিয়া

- ✓ বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার।
- ✓ নিরস্ত্র বাঙালির উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম খতিয়ান নথিভুক্তি।
- ✓ বিদেশি সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ব গণমাধ্যমে গণহত্যার সংবাদ প্রকাশ।
- ✓ সিদ্দিক সালিকের উইটনেস টু সারেন্ডার ও রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার গ্রন্থে বর্বরোচিত ঘটনার সাক্ষ্য ও বর্ণনা।

২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ড পাকিস্তানের ভাঙনকে চূড়ান্তরূপে সম্পন্ন করে তোলে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও প্রতিরোধ সময়রেখা

পটভূমি ও রাজনৈতিক সংকট

১৯৭০ এর নিরঙ্কুশ জয়: সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে।

অপারেশন সার্চলাইট: ২৫ মার্চ রাতে বর্বরতম সামরিক অভিযান চালিয়ে নিরীহ বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী।

নেতৃত্বের সংকটকালে প্রতিরোধ: বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও চরম সংকটময় মুহূর্তে দেশব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রতিরোধের ঐতিহাসিক সময়রেখা

- **২৫ মার্চ, ১৯৭১ (রাত)**
  অপারেশন সার্চলাইট শুরু ও দেশব্যাপী বর্বরতম গণহত্যা।
- **২৬ মার্চ, ১৯৭১**
  মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার।
- **২৭ মার্চ, ১৯৭১**
  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমানের পুনরায় ঘোষণা প্রদান।

স্বাধীনতার ঘোষণা এবং এর তাৎপর্য

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ

২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী বাংলার আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে। কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এই ঘোষণা যুদ্ধের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ:** বিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে একটি সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তর করে।
- **আইনি বৈধতা:** মুজিবনগর প্রবাসী সরকার গঠনে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথ সুগম করে।
- **বিশ্ব জনমত সৃষ্টি:** বিশ্বের বুকে এটিকে অভ্যন্তরীণ সংকট নয়, বরং একটি নিপীড়িত জাতির অধিকারের যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে।

পাঁচ সাংবিধানিক স্থপতি

এ. কে. ফজলুল হক
কৃষক প্রজা আন্দোলন ও লাহোর প্রস্তাব

এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী
সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও আওয়ামী লীগ গঠন

বাংলাদেশ
সার্বভৌমত্ব ও মুক্তির পাঁচ সুরকার

মওলানা ভাসানী
প্রান্তিক কৃষক ও কগমারী সম্মেলন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
স্বাধীনতার স্থপতি ও মুক্তির প্রতীক

নেতৃত্ব	মূল অবদান	আদর্শিক মূল ভিত্তি	ঐতিহাসিক টাইটেল
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক	বাংলার প্রজাস্বত্ব রক্ষা ও ঋণ সালিশি বোর্ড প্রতিষ্ঠা	কৃষক প্রজা অধিকার, সামাজিক সমতা ও শিক্ষা বিস্তার	শেরে বাংলা (বাংলার বাঘ)
জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)	স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ, সেক্টর কমান্ডার ও সার্ক উদ্যোগ	জাতীয় পুনর্গঠন, স্বনির্ভর অর্থনীতি ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	বীর উত্তম (মুক্তিযুদ্ধের খেতাব)

এ. কে. ফজলুল হক: প্রাথমিক জীবন ও ভিত্তি

"বাংলার বাঘ" এর আত্মপ্রকাশ

১৮৭৩ সালের ২৬শে অক্টোবর বরিশালে জন্ম নেওয়া আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন অদম্য মেধাবী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে ট্রিপল অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৯৭ সালে আইন পেশায় যোগ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেন। তবে আইনজীবী হিসেবে বিলাসী জীবন যাপনের বদলে তিনি পূর্ব বাংলার অবহেলিত ও ঋণগ্রস্ত সাধারণ কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

সাংগঠনিক রাজনীতিতে আগমন

১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং কৃষকদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে ব্রতী হন।

কৃষক প্রজা আন্দোলন ও জমিদার বিরোধী সংগ্রাম

ফজলুল হকের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলায় ব্রিটিশ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে ওঠা "জমিদার প্রথা"র সমূলে উচ্ছেদ। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষকদের মুক্তি ব্যতীত বাংলার প্রকৃত মুক্তি অসম্ভব।

এই লক্ষ্যে তিনি ১৯২৯ সালে **কৃষক প্রজা পার্টি** (KPP) গঠন করেন। এটি ছিল বাংলার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠা প্রথম সফল কৃষকমুখী দল, যা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের দরিদ্র চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

এ. কে. ফজলুল হক: রাজনৈতিক জীবন ও দর্শন

বাংলার প্রধানমন্ত্রী

১৯৩৭ সালে ফজলুল হক বাংলার প্রথম কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বৃত্তি ব্যবস্থা চালু করেন।

লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের খসড়া তৈরি ও উত্থাপন করেন ফজলুল হক। এতে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করা হয়, যা পরোক্ষভাবে পূর্ব বাংলার ভিন্ন মানচিত্রের ইঙ্গিত দেয়।

স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা

লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত 'States' শব্দটি পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যা পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়।

আদর্শিক স্তম্ভসমূহ

- **কৃষক অধিকার**: কর ও খাজনার জোয়াল থেকে দরিদ্র কৃষকদের আইনি সুরক্ষা প্রদান।
- **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি**: ধর্মীয় বিভেদের রাজনীতির বদলে অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে জোর।
- **আইনি সংস্কার**: জমিদারদের একতরফা ক্ষমতা হ্রাস করে প্রজাদের ভূমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা।

কৃষি ঋণ মুক্তি

১৯৩৮ সালে ঐতিহাসিক "বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন" পাস করেন, যার মাধ্যমে ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে লাখ লাখ কৃষককে মহাজনের শোষণ থেকে বাঁচান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার

লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ, ইডেন কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ গ্রামীণ জনপদে শত শত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তহবিল বরাদ্দ করেন।

প্রশাসনিক সমতা

সরকারি চাকরিতে অনগ্রসর বাঙালি মুসলমানদের জন্য ন্যায়সঙ্গত কোটা প্রবর্তন করে মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনে অবদান রাখেন।

ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

নিপীড়িত কৃষকদের পাশে অবিচল থাকার কারণে বাঙালি সমাজ তাঁকে আজীবন শ্রদ্ধায় "শেরে বাংলা" বা বাংলার বাঘ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী

গণতন্ত্রের মানসপুত্র ও অবিভক্ত বাংলা

১৮৯২ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রাক্কালে তিনি বাংলায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি রোধ করতে এবং স্বাধীন সার্বভৌম "অবিভক্ত বাংলা" গঠনে অবিস্মরণীয় প্রস্তাব দেন।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) গঠনে তাঁর মূল সাংগঠনিক ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সূচনা করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে (১৯৫৬-১৯৫৭) তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভারসাম্য ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় লড়াই করেছেন।

সাংবিধানিক শাসন ও লিগ্যাল এক্টিভিজম

সোহরাওয়ার্দী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার প্রধান হাতিয়ার হলো বলিষ্ঠ বিরোধী দল গঠন এবং আইনের শাসন রক্ষা। তিনি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে ভোটার তালিকা বা পৃথক নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং যৌথ নির্বাচনের দাবি তোলেন।
তাঁর সুদক্ষ আইনি লড়াই এবং পরামর্শে তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীকালের এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। সোহরাওয়ার্দীর সূচিত সাংবিধানিক রাজনীতিই বাংলার তরুণ প্রজন্মকে অধিকার আদায়ে আইনানুগ পথে লড়তে শেখায়।

মূল্যায়ন

- **গণতন্ত্রের মানসপুত্র**: সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ও আপসহীন।
- **তরুণদের মেন্টর**: বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক শিক্ষক ও অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস।
- **অখণ্ড বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা**: হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ওপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

মওলানা ভাসানী: মেহনতি মানুষের কণ্ঠস্বর

"মজলুম জননেতা" এর গণবিদ্রোহ

১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এক অবিচল সমাজ সংস্কারক। আসামের বাঙালি চাষীদের অধিকার রক্ষায় ঐতিহাসিক "লাইন প্রথা" বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি।

১৯৪৯ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন, যা ছিল পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রথম সুসংগঠিত দলীয় প্ল্যাটফর্ম। আজীবন ক্ষমতার মোহ দূরে ঠেলে তিনি মাঠে-ঘাটে মেহনতি কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কৃষক একতা ও সমাজতন্ত্র

মওলানা ভাসানীর দর্শন ছিল সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী সমতাবাদের এক অপূর্ব মিশ্রণ। তিনি স্বনির্ভর গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি এবং বৃহৎ কলকারখানার রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন।

ফারাক্কা লং মার্চ (১৯৭৬)

জীবনের শেষভাগে ১৯৭৬ সালে নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা এবং পরিবেশগত সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবিতে তিনি ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ নেতৃত্ব দেন, যা আন্তর্জাতিক পানি কূটনীতিতে অনন্য নজির।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপসহীনতা

তিনি মার্কিন বা যেকোনো পরাশক্তির আগ্রাসী নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পরও যাতে দেশের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব অটুট থাকে, সেই লক্ষ্যে আজীবন রাজপথে অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন।

ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন (১৯৫৭)

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অব্যাহত শোষণের প্রতিবাদে পাকিস্তানকে প্রথম স্পষ্টভাষায় "আসসালামু আলাইকুম" বা বিদায় জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণকারী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এক অপ্রতিরোধ্য জাতীয় গণজাগরণে রূপ দেন। সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য হিসেবে তিনি রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সরাসরি সম্পৃক্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৬৬ সালে তিনি পেশ করেন বাঙালির ঐতিহাসিক মুক্তি সনদ "**ছয় দফা কর্মসূচি**"। নিজস্ব মুদ্রা, স্বায়ত্তশাসিত কর ব্যবস্থা এবং আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের এই দাবি কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্বের রাজপথ নির্মাণ করেছিল।

৭ই মার্চের ডাক ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের কালজয়ী ভাষণ বাঙালির সামগ্রিক মনস্তত্ত্বকে যুদ্ধের মুখোমুখি প্রস্তুত করে দেয়। ২৫শে মার্চ কালো রাতে গ্রেপ্তারের পূর্বমুহূর্তে তাঁর প্রেরিত আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রধান শক্তি ছিল।

১৯৭২ সালে পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে ফিরে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো পুনর্গঠন এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও সমতাভিত্তিক ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নে হাত দেন, যা বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হয়।

সংবিধানের চার মূলনীতি

- **জাতীয়তাবাদ**: বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তিতে অখণ্ড জাতিসত্তা নির্মাণ।
- **সমাজতন্ত্র**: শোষণমুক্ত ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **গণতন্ত্র**: বহুত্ববাদী রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি।
- **ধর্মনিরপেক্ষতা**: সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার সমান নিশ্চয়তা।

জিয়াউর রহমান: রণক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র গঠন

স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ ও জেড-ফোর্স কমান্ডার

১৯৩৬ সালে বগুড়ায় জন্ম নেওয়া জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অত্যন্ত চৌকস ও সাহসী তরুণ মেজর। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করে অবরুদ্ধ দেশবাসীকে আশার আলো দেখান।

যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি প্রথমে ১১ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক এবং পরে নিয়মিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম ব্রিগেড "জেড-ফোর্স" এর সর্বাধিনায়ক হিসেবে বহু সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার স্বাক্ষর রাখেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত হন।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারে হাত দেন। বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের গোড়াপত্তন তাঁর আমলেই হয়েছিল।

খাল খনন ও কৃষি বিপ্লব

স্বনির্ভর ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থার প্রসারে তিনি দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচির সূচনা করেন, যা সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে খাদ্য উৎপাদন বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়।

সার্ক (SAARC) এর রূপকল্প

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে পারস্পরিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার স্বার্থে তিনি সার্ক গঠনের মূল প্রস্তাবনা দেন, যা ১৯৮৫ সালে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে তাঁর আঞ্চলিক কূটনীতির দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয়।

সামরিক অবদান

মুক্তিবাহিনীর প্রথম সমন্বিত ব্রিগেড পরিচালনা করে নিয়মিত সেনা ইউনিট গঠনে অভূতপূর্ব অবদান রাখেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বজ্রকণ্ঠ

স্বাধীনতার মনস্তাত্ত্বিক দিকনির্দেশনা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে মুক্তির সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করেন।

- পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই আপামর জনতাকে প্রতিরোধের মানসিক শক্তি যোগায়।
- পরোক্ষভাবে গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
- ভাষণের ঐতিহাসিক বাণী মুক্তিকামী বাঙালির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল পেশাদার সামরিক বাহিনীর লড়াই ছিল না; এটি ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণযুদ্ধ।

- কৃষক, শ্রমিক ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত যুবকেরা গেরিলা বাহিনীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- ছাত্র সমাজ এবং তরুণরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়ে রণাঙ্গনকে সচল রাখেন।
- নারীরা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেন।

১১টি সেক্টর ও পরিকল্পিত যুদ্ধ

রণক্ষেত্র বিন্যাস

আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ পরিচালনার স্বার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সামরিক সেক্টরে এবং অসংখ্য সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

যৌথ প্রতিরোধ শক্তি

বাঙালি সেনা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সাধারণ বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত গেরিলা ও নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়।

সেক্টর কমান্ডারদের ভূমিকা

পেশাদার সেক্টর কমান্ডারদের রণকৌশলগত নেতৃত্বে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

আন্তর্জাতিক জনমত ও বিশ্ব সংহতি

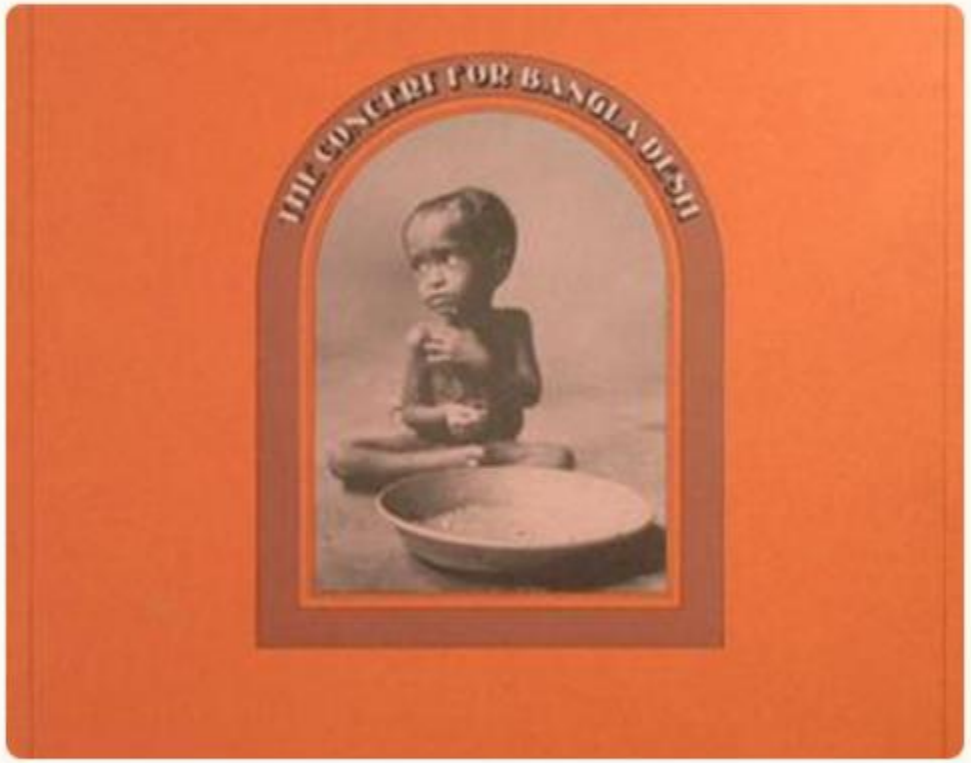

বিশ্ববাসীর মানবিক সংহতি

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিশ্ব রাজনীতির সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

- **প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা:** বহির্বিশ্বে জনমত গঠন, তহবিল সংগ্রহ ও পাকিস্তানি নৃশংসতার প্রমাণ বিশ্বদরবারে উন্মোচন।
- **ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক লড়াই:** নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" বিশ্বের বিবেককে নাড়া দেয়।
- **বিশ্ব নেতাদের সাড়া:** বিশ্ব নাগরিক ও সমাজকর্মীদের ব্যাপক চাপের মুখে বিভিন্ন বিদেশি সরকার নৈতিক সমর্থন দিতে বাধ্য হয়।

১৬ ডিসেম্বর: ঐতিহাসিক বিজয়

১৬

ডিসেম্বর ১৯৭১ । মহান বিজয় দিবস

চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ও আত্মপ্রকাশ

দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিজয়ের পূর্ণতা লাভ ঘটে।

> ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ।

গণহত্যা ও অপারেশন সার্চলাইট

অপারেশন সার্চলাইট

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে নির্বিচারে নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যার লক্ষ্যে পরিচালিত নৃশংসতম সামরিক অভিযান।

২৫শে মার্চ কালরাত

মানব ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্টতম ও কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড যা দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের স্বাধীনতাকে দমন করতে চেয়েছিল।

গণকবর ও বধ্যভূমি

সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বধ্যভূমি এবং গণকবরসমূহ পাকিস্তানি ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পৈশাচিকতার নীরব সাক্ষী।

২৫ মার্চ
অপারেশন সার্চলাইট ও আক্রমণ শুরু

দীর্ঘ ৯ মাস
সারাদেশে ধারাবাহিক নৃশংস গণহত্যা

১৪ ডিসেম্বর
পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

১৬ ডিসেম্বর
চূড়ান্ত বিজয় ও মুক্তি অর্জন

চুকনগর গণহত্যা ও ট্র্যাজেডি

১ **১৮-১৯ মে:** ভারতের সীমান্তের নিকটবর্তী চুকনগরে বিপুল সংখ্যক মানুষ জড়ো হতে থাকে।

২ **২০ মে বেলা ১১টা:** পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আকস্মিকভাবে অতর্কিত হামলা চালায়।

৩ **নিষ্ঠুর বর্বরতা:** ৩ ঘণ্টাব্যাপী ব্রাশফায়ারে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ভদ্রা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

⚠ প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে মৃতের সংখ্যা ১৩,০০০-এর বেশি। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় একক গণহত্যা।

নারীনির্যাতন ও বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন

নির্যাতনের ভয়াবহ ধরন

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দালাল (রাজাকার, আল-বদর) কর্তৃক লক্ষাধিক বাঙালি নারী অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হন।

- শারীরিক ও মানসিক চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা।
- সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করার চক্রান্ত।
- দালাল চক্রের প্রত্যক্ষ মদদে নারীদের ক্যাম্পে বন্দি রাখা।

সম্মাননা ও পুনর্বাসন

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্যাতিত নারীদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার্থে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্বাসন শুরু করেন।

- নির্যাতিত নারীদের '**বীরাঙ্গনা**' রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করা।
- বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি প্রদান।
- চিকিৎসা প্রদান, বিবাহ ও কর্মসংস্থানমূলক পুনর্বাসন বোর্ড গঠন।

শরণার্থী ও ভারতের ঐতিহাসিক অবদান

১ কোটি

সর্বমোট শরণার্থী

দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া নাগরিক

৯৪%

ভারতে আশ্রয়

সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্য ও শিবির

৬% শরণার্থী

পার্বত্য বা অন্যান্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেন

ঐতিহাসিক ক্যাম্প

খাদ্য, বাসস্থান ও সার্বিক সামরিক সাহায্য

শরণার্থীদের মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরের যাত্রা

১. **২৬ মার্চ থেকে শুরু:** পাকিস্তানি নির্মমতায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দেশত্যাগ।

২. **শরণার্থী শিবির:** আশ্রয় নিয়ে যুবকদের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেওয়ার আগ্রহ।

৩. **যুব শিবির ও প্রশিক্ষণ:** ভারতের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও গেরিলা প্রশিক্ষণ।

৪. **মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ:** দেশের মাটিতে ফিরে স্বাধীনতার মূল লড়াইয়ে ভূমিকা।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন (মুজিবনগর)

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা, স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি এবং প্রশাসনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক।

> ⚑ এই সরকারের সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ দীর্ঘ ৯ মাসের লড়াই শেষে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১: মুজিবনগরে সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

১০ এপ্রিল
প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন

১৭ এপ্রিল
মুজিবনগরে সরকারের মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ

মুজিবনগর
মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকে অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা

কলকাতা
৮ নং থিয়েটার রোডে প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থাপন

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব

রাষ্ট্রপতি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় দেশের প্রধান নেতা)

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন)

প্রধানমন্ত্রী
তাজউদ্দীন আহমদ
(সরকার পরিচালনা ও প্রধান সমন্বয়কারী)

অর্থমন্ত্রী
এম. মনসুর আলী

পররাষ্ট্র ও আইন
খন্দকার মোশতাক আহমদ

স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন
এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান

বিশেষ দায়িত্ব ও প্রশাসনিক সচিবালয়

বিশেষ কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব

- বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ন্যায্যতার পক্ষে প্রচার ও লবিং জোরদার করা।
- প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে পরিকল্পনা সেল এবং নীতি গঠন।
- মুক্তাঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয় করা।

প্রশাসনিক সচিবালয় ও পরিচালনা

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রশাসনিক সচিবালয় ও শাখা গড়ে তোলা।
- কলকাতা থেকে সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ।
- মুক্তিবাহিনী ও সাধারণ জনগণের জন্য ত্রাণ, খাদ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা।

মুক্তির সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলন

২৫শে মার্চ কালরাতের সাথে সাথেই বাংলার প্রতিটি মানুষ নিজের যার যা আছে তা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় সুসংগঠিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রতিরোধের মূল চালিকাশক্তি ছিল।

দেশকে স্বাধীন করতে অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র হাতে যাত্রা

২৫ মার্চ
স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু

১০ এপ্রিল
মুজিবনগর সরকার গঠন

১১ সেক্টর
সারাদেশে সেক্টর বিভক্তি ও সুশৃঙ্খল কমাণ্ড

মুক্তিবাহিনী
নিয়মিত গেরিলা ও চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ

প্রতিরোধের দ্বিবিধ রূপ ও বিবর্তন

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ

কালরাতের আক্রমণের সাথে সাথেই সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে:

- পুলিশ, ইপিআর এবং দেশের সাধারণ জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ।
- ছাত্র, যুবক ও মেহনতি মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ সৃষ্টি।
- কোনো কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছাড়াই বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ লড়াই।

সংগঠিত প্রতিরোধ

পরবর্তীতে অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে প্রতিরোধ শৃঙ্খলার রূপ নেয়:

- এম. এ. জি. ওসমানীর নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল মুক্তিবাহিনী গঠন।
- নিয়মিত ও অনিয়মিত (গেরিলা) বাহিনীতে বিন্যাস।
- দেশব্যাপী ১১টি সেক্টর ও ৩টি বৃহৎ ব্রিগেড ফোর্স গঠন।

ছাত্র-যুবক → পুলিশ ও ইপিআর → বাঙালি সেনা সদস্য → সুসংগঠিত মুক্তিবাহিনী

যুদ্ধ পরিচালনায় ১১টি সেক্টর

সমগ্র বাংলাদেশকে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়:

সেক্টর ১
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকা

সেক্টর ২
ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী

সেক্টর ৩
হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ (আংশিক)

সেক্টর ৪
সিলেট পূর্বাঞ্চল

সেক্টর ৫
সিলেট পশ্চিমাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকা

সেক্টর ৬
রংপুর ও দিনাজপুর

সেক্টর ৭
রাজশাহী ও পাবনা

সেক্টর ৮
কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা (আংশিক)

সেক্টর ৯
বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা উপকূল

সেক্টর ১০
নৌ কমান্ডো বাহিনী

সেক্টর ১১
ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল

সেক্টর ১০ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী নৌ-উইং যেখানে কোনো নির্দিষ্ট সেক্টর কমান্ডার স্থায়ী ছিলেন না, এটি সরাসরি সদর দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো।

মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ ব্রিগেড ফোর্সসমূহ

মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ইউনিটের অংশ হিসেবে ৩টি বড় ব্রিগেড ফোর্স গঠন করা হয়েছিল:

জেড ফোর্স

Z Force

- **অধিনায়ক:** মেজর জিয়াউর রহমান।
- **গঠন:** ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে।
- সিলেট, ময়মনসিংহ অঞ্চলে অসীম সাহসিকতায় যুদ্ধ পরিচালনা করে।

এস ফোর্স

S Force

- **অধিনায়ক:** মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ।
- **গঠন:** ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে।
- প্রধানত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সফল যুদ্ধ পরিচালনা করে।

কে ফোর্স

K Force

- **অধিনায়ক:** মেজর খালেদ মোশাররফ।
- **গঠন:** ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।
- কুমিল্লা, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অকুতোভয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

জেড ফোর্সের কার্যক্রম ও গুরুত্ব

প্রথম সামরিক ব্রিগেড ফোর্স

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে গঠিত 'জেড ফোর্স' ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নিয়মিত ব্রিগেড। এটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মিত বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে গড়ে ওঠে।

- নিয়মিত বাহিনীর প্রথম সুসংগঠিত পদক্ষেপ।
- প্রধান লক্ষ্য ছিল শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানা।
- সিলেটের শমশেরনগর, কানাইঘাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলে স্মরণীয় যুদ্ধ জয়।

গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধের সমন্বয়

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কৌশলগত সহযোগিতায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের সমন্বয় করে জেড ফোর্স বিভিন্ন বড় যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল।

- সুনির্দিষ্ট সমন্বয় ও উন্নত রণকৌশল ব্যবহার।
- নিয়মিত যুদ্ধের পাশাপাশি সফল গেরিলা আক্রমণ।
- জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে গভীর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।

জেড ফোর্সের রণকৌশল ও ঐতিহাসিক অবদান

জেড ফোর্সের সুশৃঙ্খল সামরিক অভিযান পাকিস্তানি হানাদারদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে ভূমিকা রাখে। তাদের কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং একের পর এক সফল অভিযান স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্সের অবদান অপরিসীম যা স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি গড়তে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল।

জেড ফোর্সের অগ্রযাত্রা

- সামরিক কৌশল ও কঠোর প্রশিক্ষণ
- ভারতীয় বাহিনীর সাথে সফল সমন্বয়
- সুনির্দিষ্ট সম্মুখ ও গেরিলা আক্রমণ
- বিজয় ও দেশের চূড়ান্ত স্বাধীনতা

মুক্তিবাহিনীর গঠন ও কেন্দ্রীয় কমান্ড

প্রতিরোধ যুদ্ধ ও যুবশক্তি

বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর দেশের প্রতিরোধযুদ্ধ সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে আসে। হাজার হাজার বীর তরুণ গেরিলা ও সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যায়।

নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী

সামরিক বাহিনী, ইপিআর, আনসার ও পুলিশের সমন্বয়ে প্রথমে **মুক্তিফৌজ** গঠিত হয় যা পরবর্তীতে **মুক্তিবাহিনী** নামে পরিচিতি লাভ করে। মুক্তিবাহিনী প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত ছিল।

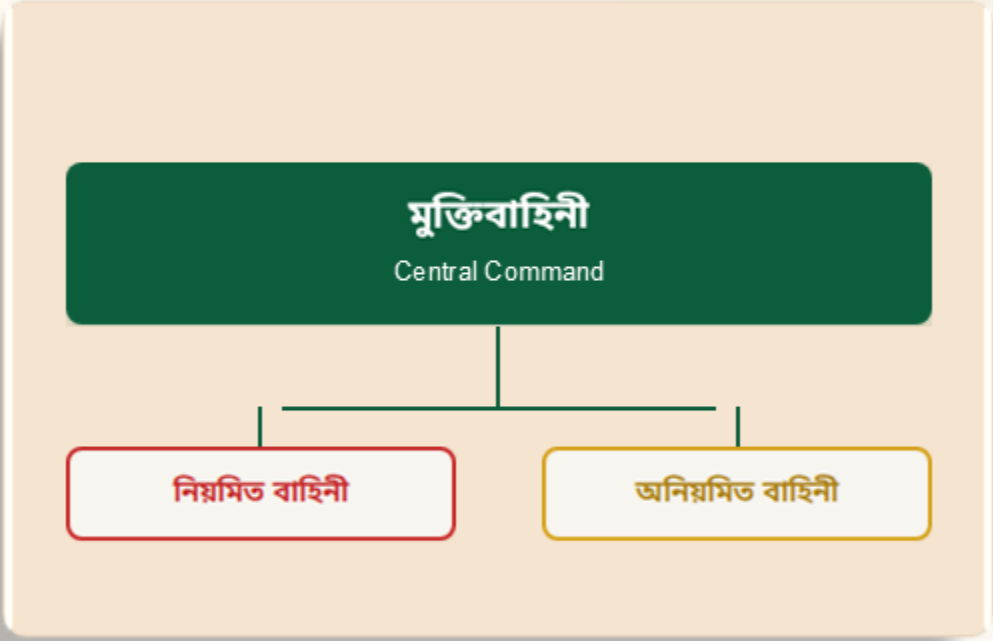

অনিয়মিত বাহিনী (গেরিলা ও গণবাহিনী)

প্রশিক্ষণরত বাংলার গেরিলা বা গণবাহিনী (১৯৭১)

ছাত্র ও যুবক

দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবকরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয়।

কৃষক ও সাধারণ

কৃষক-শ্রমিক এবং মেহনতি মানুষ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে।

প্রশিক্ষণ ও রণাঙ্গন

মাত্র ২ সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত সামরিক ও গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকার পরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশে পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর অতর্কিত গেরিলা হামলা পরিচালনা করে।

বিভিন্ন অনিয়মিত বাহিনীর রূপরেখা

মুজিব বাহিনী

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বাছাইকৃত বিশ্বস্ত তরুণদের নিয়ে বিশেষভাবে গঠিত অত্যন্ত দুর্ধর্ষ বাহিনী।

বিশেষ গেরিলা

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত পৃথক সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী।

কাদেরিয়া বাহিনী

টাঙ্গাইল অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পরিচালিত দুর্ধর্ষ আঞ্চলিক বাহিনী।

হেমায়েত বাহিনী

গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলে বীর প্রতীক হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সক্রিয় গ্রুপ।

আফসার বাহিনী

ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্থানীয় উদ্যোগে আফসার উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী।

আকবর বাহিনী

মাগুরা ও শ্রীপুর এলাকায় আকবর হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত লড়াকু প্রতিরোধ গ্রুপ।

নিয়মিত বাহিনী (নিয়মিত সেনাদল)

গঠন ও সদস্য সংখ্যা

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় নিয়মিত বাহিনী। এতে মোট প্রায় **১৮,৬০০ জন** নিয়মিত সেনাসদস্য সক্রিয় ছিলেন।

ত্রিমাত্রিক বাহিনী গঠন

নিয়মিত বাহিনীর পদাতিক ইউনিটের পাশাপাশি যুদ্ধের শেষের দিকে বাংলাদেশ সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী স্বকীয় রণকৌশল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

সেনাবাহিনী (Army)

৯ অক্টোবর ১৯৭১ • জলপাইগুড়িতে সূচনা

নৌবাহিনী (Navy)

আগস্ট ১৯৭১ • এমভি পদ্মা ও পলাশ জাহাজ

বিমানবাহিনী (Airforce)

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ • ডিমাপুর ঘাঁটি (ভারতের নাগাল্যান্ড)

রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক বিশেষ বাহিনী

মুজিব বাহিনী (বিএলএফ)

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর জেনারেল ওবান এবং শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখের সরাসরি তদারকিতে গঠিত বিশেষ বাহিনী। এটি ৪টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল:

- উত্তরাঞ্চল
- দক্ষিণাঞ্চল
- পূর্বাঞ্চল
- উত্তরাঞ্চল / কেন্দ্রীয়

অন্যান্য দলীয় মিলিশিয়া

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে দলীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বতন্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- বামপন্থি ছাত্র ইউনিয়ন সশস্ত্র সেল
- ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) বাহিনী
- কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপ

মূল আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ

কাদেরিয়া বাহিনী

টাঙ্গাইল ও সংলগ্ন ময়মনসিংহ অঞ্চল

হেমায়েত বাহিনী

গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর অঞ্চল

বাতেন বাহিনী

টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও পাবনা

আফসার ব্যাটালিয়ন

ময়মনসিংহ ভালুকা অঞ্চল

আকবর বাহিনী

মাগুরা জেলা ও সংলগ্ন এলাকা

লতিফ মির্জা বাহিনী

সিরাজগঞ্জ ও পাবনা অঞ্চল

আঞ্চলিক বাহিনীর ভূমিকা

- আকস্মিক ও দ্রুত গেরিলা আক্রমণ
- স্থানীয় শত্রুঘাঁটি ধ্বংস ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ
- নতুন যুবকদের রিক্রুট ও তাৎক্ষণিক ট্রেইনিং
- অবরুদ্ধ দেশের ভেতরের জনগণের মনোবল বৃদ্ধি

মুক্তিযুদ্ধে প্রচার মাধ্যম ও বেতারের ভূমিকা

"।" স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধে অবরুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ও সম্মুখ সমরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এটি রণক্ষেত্রের তথ্যের পাশাপাশি স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়।

২৬ মার্চ কালুরঘাট → **এপ্রিল** ত্রিপুরা → **মে-ডিসেম্বর** কলকাতা → **৬ ডিসেম্বর** বাংলাদেশ বেতার

ঐতিহাসিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

স্বাধীন বাংলা বেতারের মূল কার্যক্রম

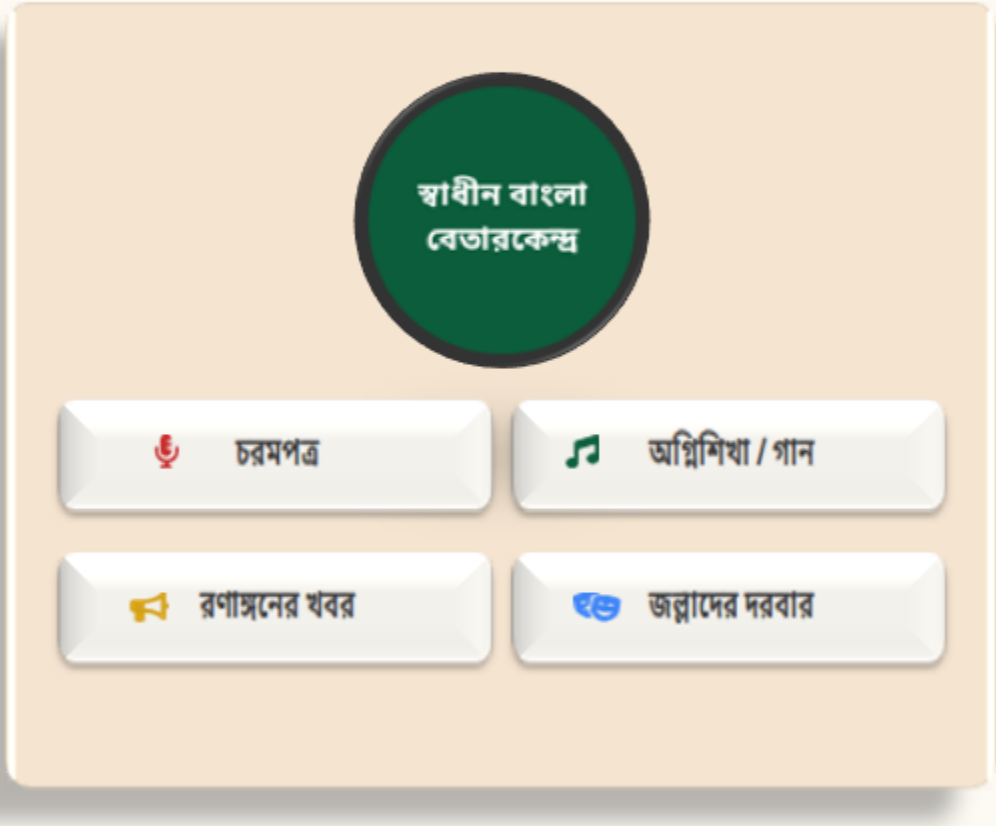

জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসমূহ

এম আর আখতার মুকুলের কথিকামালা '**চরমপত্র**' এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যঙ্গাত্মক নাটক '**জল্লাদের দরবার**' অবরুদ্ধ জনগণকে আশার আলো দেখাত ও পাকসেনাদের যুদ্ধভীতি বাড়িয়ে দিত।

প্রচারের মূল লক্ষ্য

- সর্বস্তরের বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ও প্রতিরোধে উদ্‌বুদ্ধ করা।
- রণাঙ্গনে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক মনোবল ও উদ্দীপনা দান।
- বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বিদেশি প্রচার মাধ্যম ও বিশ্বসংবাদ

আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র

বিশ্বের স্বনামধন্য গণমাধ্যমসমূহ বাংলাদেশে চালানো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যার নির্মম চিত্র প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সজাগ করে তোলে।

- BBC (লন্ডন)
- The Times
- The Guardian
- Daily Telegraph

প্রধান বিদেশি বেতার

আন্তর্জাতিক বেতার সম্প্রচারসমূহ বিশ্বজনমত গঠনে এবং মুক্তিবাহিনীর বিজয়গাথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে।

- আকাশবাণী (ভারত)
- BBC ওয়ার্ল্ড সার্ভিস
- ভয়েস অব আমেরিকা
- অস্ট্রেলিয়া বেতার

ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের অবদান

ছাত্রসমাজ

মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সিংহভাগই ছিল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহসী ছাত্রসমাজ। তারা অত্যন্ত দ্রুত গেরিলা যুদ্ধকৌশল শিখে মরণজয়ী যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়।

নারীসমাজ

সরাসরি যুদ্ধ, চিকিৎসাসেবা প্রদান, খবর এবং রসদ আদান-প্রদানসহ অবরুদ্ধ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় এবং অস্ত্র পরিবহনে সাহসী ভূমিকা রাখেন বাংলার নারীরা।

সাধারণ মানুষ

কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার এবং সাধারণ দিনমজুর জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের পথপ্রদর্শক এবং তথ্য আদান প্রদানের কাজ করে বিজয় ত্বরান্বিত করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বীর নারী সমাজের ভূমিকা

প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশের নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা (১৯৭১)

সরাসরি যুদ্ধ

তারামন বিবি (বীর প্রতীক), কাঁকন বিবি এবং খালেদা খানমের মতো বীর নারীরা সম্মুখ সমরে লড়েছেন।

চিকিৎসাসেবা ও আশ্রয়

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় ডাক্তার, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবক নারীদের অবদান ছিল অনন্য।

প্রশিক্ষণ শিবির

গোবরা ও লেম্বুছড়া ক্যাম্পে নারীদের সুনির্দিষ্ট গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রচার ও ক্যাম্পেইন

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বজনমত ও ত্রাণ সংগ্রহে অংশ নেন বহু নারী।

পাকিস্তানের দোসর ও সহযোগী বাহিনীসমূহ

পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীকে বৈরী ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে দেশের ভেতরের কিছু স্বাধীনতাবিরোধী কুচক্রী মহল বিশেষভাবে সহায়তা করে।

রাজাকার

মে ১৯৭১ সালে খুলনায় প্রথম গঠিত হয়। তারা সরাসরি হানাদারদের অগ্রগামী সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে।

আলবদর

জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ছাত্রসংঘের দ্বারা গঠিত ঘাতক দল, যা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে কুখ্যাত ভূমিকা রাখে।

আলশামস

অন্যান্য রক্ষণশীল ও ডানপন্থি ছাত্রসংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে হানাদারদের দ্বিতীয় সহযোগী গ্রুপ হিসেবে গঠিত।

শান্তি কমিটি

স্বাধীনতাবিরোধী নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত সমন্বয়কারী ও নীতি নির্ধারণী প্যানেল।

১৪ ডিসেম্বর: নির্মম বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

স্মৃতিতে ১৪ ডিসেম্বর

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

চূড়ান্ত পরাজয়ের মাত্র ২ দিন পূর্বে পরিকল্পিতভাবে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করা হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করা।

- শিক্ষক
- সাংবাদিক
- চিকিৎসক
- আইনজীবী
- বুদ্ধিজীবী
- শিল্পী

শিক্ষাবিদ

- মুনীর চৌধুরী
- আনোয়ার পাশা
- ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব
- ড. মোফাজ্জল হায়দার

চিকিৎসক

- ডা. আলীম চৌধুরী
- ডা. ফজলে রাব্বী
- ডা. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা
- ডা. গোলাম মোর্তজা

সাংবাদিক

- সিরাজুদ্দীন হোসেন
- সেলিনা পারভীন
- শহীদুল্লাহ কায়সার
- মেহেরুন্নেসা

অন্যান্য শিল্পী

- জহির রায়হান (চলচ্চিত্রকার)
- আলতাফ মাহমুদ (সুরকার)
- রণদাপ্রসাদ সাহা (দানবীর)
- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (রাজনীতিক)

মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তিসমূহের ভূমিকা

পাকিস্তানের পক্ষে পরাশক্তি

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান রক্ষার জন্য কিছু পরাশক্তি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে কূটনৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা করে:

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- চীন

বাংলাদেশের সপক্ষে পরাশক্তি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম সংকটময় মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য প্রদান এবং কূটনৈতিক সুরক্ষা দেয় এই রাষ্ট্রগুলো:

- সোভিয়েত ইউনিয়ন
- ভারত

সহানুভূতিশীল মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা (ব্রিটেন ও ফ্রান্স):

ব্রিটেন ও ফ্রান্স সরাসরি কোনো পক্ষে প্রকাশ্যে অংশ না নিলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে তাদের গণমাধ্যম ও জনমত তৈরিতে পরোক্ষ অবদান রাখায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানকে অস্ত্র ও রাজনৈতিক সমর্থন দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর মনোবল ভাঙতে রণাঙ্গনের বঙ্গোপসাগরে '**সপ্তম নৌবহর**' (Seventh Fleet) প্রেরণ করে হুমকি দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

জাতিসংঘে মার্কিন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে কূটনৈতিক রক্ষা ঢাল গঠন করে। তারা বঙ্গোপসাগরে নিজেদের পরমাণু সাবমেরিন মোতায়েন করে মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে নিষ্ক্রিয় রাখে।

ভারত

১ কোটি শরণার্থীর আশ্রয় ও খাদ্যের বন্দোবস্ত করে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র ও উন্নত প্রশিক্ষণ সরবরাহ করে এবং শেষ পর্যায়ে যৌথ বাহিনী গঠন করে সরাসরি পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করতে অবদান রাখে।

প্রবাসী বাঙালি ও বিশ্বের নাগরিক সমাজ

প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলন

বিশেষ করে যুক্তরাজ্য (লন্ডন), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালিরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারা বাংলাদেশ তহবিল নামে বিশ্বব্যাপী অর্থ সংগ্রহ এবং কূটনৈতিক দেনদরবার জোরদার করেন।

লন্ডনের অনন্য ভূমিকা

লন্ডনকে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের **'তৃতীয় যুদ্ধক্ষেত্র' (Third Front)**। এখান থেকে প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের ওপর চাপ তৈরি করে স্বাধীনতার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখেন।

লন্ডন (কেন্দ্রীয়) → নিউইয়র্ক → ওয়াশিংটন → জাতিসংঘে প্রতিবাদ

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কূটনৈতিক কূটনীতি

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে চলে যান এবং প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির পুরোধা ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বাংলাদেশ সরকার তাকে বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করে।

২৬ মার্চ ১৯৭১: লন্ডন যাত্রা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে অবস্থান ঘোষণা।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট: লর্ড ব্রোকওয়েসহ ব্রিটিশ সাংসদদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব: জেনেভা ও নিউইয়র্কে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক সংগ্রামের অগ্রনায়ক আবু সাঈদ চৌধুরী

জাতি গঠন: পরিচিতি ও সংজ্ঞা

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জাতি গঠন একটি দীর্ঘ, ধারাবাহিক ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণ ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অভিন্ন লক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী ও টেকসই রাষ্ট্র নির্মাণ করে।

মূল লক্ষ্য:
ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অভিন্ন জাতীয় পরিচয় ও দেশপ্রেমের ভিত্তিতে সামষ্টিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

"জাতি হলো এমন একটি মানবগোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও মানসিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।"

— আর্নল্ড টয়নবি (Arnold Toynbee)

"জাতি হলো একটি কল্পিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়(ওসধমরহবফ চড়ঁবরঃরপধব ঈড়সসঁহরঃ)।"

— বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন (Benedict Anderson)

জাতি গঠনের সরল প্রবাহ: জনগণ → ভাষা ও সংস্কৃতি → অভিন্ন ইতিহাস → জাতীয় ঐক্য → শক্তিশালী রাষ্ট্র

জাতি গঠনের প্রধান উপাদানসমূহ

একটি রাষ্ট্র নির্মাণের ৮টি মৌলিক স্তম্ভ

- ভাষা ও সংস্কৃতি
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য
- অভিন্ন লক্ষ্য
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান
- রাজনৈতিক দল
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- আন্তর্জাতিক মর্যাদা
- কার্যকর কূটনীতি

- **ভাষা ও ঐতিহ্য:** জাতীয় ঐক্যের মানসিক ও আত্মপরিচয় ভিত্তি।
- **অভিন্ন আদর্শ:** ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় অগ্রগতির স্বপ্ন।

- **প্রতিষ্ঠান ও কূটনীতি:** সুশাসন এবং বৈশ্বিক অঙ্গনে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও প্রভাব রক্ষা।
- **অর্থনৈতিক সক্ষমতা:** আত্মনির্ভরশীল ও সুষম সমাজ বিনির্মাণ।

ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্য

ভাষা হলো একটি জাতির অস্তিত্ব ও পরিচয়ের আদি ভিত্তি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন প্রমাণ করেছে মানুষ তার ভাষার জন্য রক্ত দিতে পারে, যা ছিল আমাদের জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের প্রথম সোপান। পহেলা বৈশাখ বা নবান্ন উৎসব সামাজিক বিভেদ ভুলিয়ে আমাদের এক সুতোয় বাঁধে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা

ইতিহাস জাতিকে গৌরবময় অতীত ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার আকর। পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের সচেতনতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে।

শহীদ মিনার ও মুক্তিযুদ্ধ

১৯৫২
ভাষা আন্দোলন

১৯৭১
মুক্তিযুদ্ধ

আজকের
বাংলাদেশ

অভিন্ন লক্ষ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

◎ অভিন্ন লক্ষ্য ও আদর্শ

যেকোনো বিভক্ত সমাজকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে অভিন্ন লক্ষ্য কাজ করে।

- স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা
- সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচার
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও টেকসই উন্নয়ন
- দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষা বিস্তার

সামাজিক প্রতিষ্ঠান

নাগরিকদের প্রথম নৈতিক পাঠশালা এবং মূল্যবোধের আঁতুড়ঘর।

- **পরিবার:** প্রাথমিক নৈতিক শিক্ষা
- **বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়:** জ্ঞান ও দক্ষতা
- **সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান:** বাংলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্র পরিচালনার চালিকাশক্তি এবং সুশাসনের চাবিকাঠি।

- **জাতীয় সংসদ:** আইন প্রণয়ন
- **বিচারব্যবস্থা:** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- **সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন):** নীতি ও সেবা বাস্তবায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (যেমন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১) এবং সিভিল সার্ভিস (১৯৭২ থেকে বর্তমান) দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক বিকাশের মূল নিয়ামক।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও কূটনীতি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনীতি হলো জাতি গঠনের প্রধানতম চালিকাশক্তি। সুষম অর্থনৈতিক বণ্টন এবং স্বনির্ভরতা না থাকলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

- শিল্পায়ন ও কৃষির আধুনিকায়ন
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন
- নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস

বৈশ্বিক গৌরব ও কূটনীতি

বিশ্বমঞ্চে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি দেশের নাগরিকদের গৌরব ও ঐক্যকে বাড়ায়। শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম ঢাল।

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (ভারত, চীন ও জাপান)
- বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও প্রবাসী সামাজিক শক্তি

সারসংক্ষেপ: ভাষা, ইতিহাস, আদর্শ, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্মিলিত মেলবন্ধনেই একটি শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদাশীল জাতি গড়ে ওঠে।

জাতি গঠনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

জাতিসত্তাকে চিহ্নিত করার ৮টি অনন্য চারিত্রিক দিক

ঐতিহাসিক সচেতনতা

অতীতের ত্যাগ ও সংগ্রামের গৌরবের সমষ্টিগত চেতনা।

ভাষাগত মিল

যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম।

সাংস্কৃতিক অভিন্নতা

পোশাক, আচার, উৎসব ও জীবনধারণের অভিন্ন রূপ।

ভৌগোলিক সংহতি

প্রাকৃতিক সীমারেখা ও স্বদেশের ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা।

রাজনৈতিক ঐক্য

সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য।

মানসিক সংযোগ

"আমরা এক জাতি"ড় নাগরিকদের অন্তর্গত অনুভব।

৭. **পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা**: বাণিজ্য ও কৃষির মেলবন্ধনে সম্মিলিত সংহতি।

৮. **ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ**: পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা।

বৈশিষ্ট্যসমূহের গভীর বিশ্লেষণ

মানসিক সংযোগ ও চেতনা

ভৌগোলিক সীমানার চেয়েও বড় বিষয় হলো মানুষের অন্তরের ঐক্য। "আমরা এক জাতি"ড় এই গভীর আবেগটি সংকটের সময় সমগ্র জনগণকে একত্রিত করে। এটি ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসর্গের মূল কারণ ছিল।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা

শহর-গ্রাম, শিল্প-কৃষি এবং বিভিন্ন পেশার মানুষদের মধ্যকার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা সমাজকে সুসংহত রাখে। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও ন্যায়বিচার সমাজে সংহতি ও শান্তি নিশ্চিত করে, যার অনুপস্থিতিতে বৈষম্য মাথাচাড়া দেয়।

ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অভিন্নতা এবং সহনশীলতা মানুষের মধ্যে একতা আনে। পারস্পরিক সহাবস্থান এবং পরমতসহিষ্ণুতা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অরাজকতা প্রতিরোধে সহায়ক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য

একটি দেশের আইন, সংবিধান এবং সুশাসন নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষমতার সঠিক ভারসাম্য বজায় রেখে বিভাজন কমাতে ভূমিকা রাখে।

জাতি গঠনের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

জাতীয় সংহতি অর্জনের পথে প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা

⚠ অন্তরায়ের প্রকৃতি

জাতি গঠনের প্রক্রিয়া কোনো সোজা পথ নয়। বহুমাত্রিক অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকট জনগণের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সংকীর্ণ স্বার্থ অনেক সময় জাতীয় সংহতিকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়।

> "প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা ও তার নিরসন করা টেকসই রাষ্ট্র নির্মাণের প্রথম শর্ত।"

মূল সংঘাত ও সংকটের ক্ষেত্রসমূহ

- ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ভুল রাজনৈতিক ব্যাখ্যা।
- ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং পরিচয়ের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব।
- ক্ষমতার লড়াই ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাব।
- অর্থনৈতিক চরম বৈষম্য ও সম্পদের সুষম বণ্টনের অবহেলা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সচেতনতার ভয়ানক ঘাটতি।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং অহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতি নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন বাড়ায়। ১৯৯৬-২০০১ সালের সহিংস রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরবর্তী সময়ের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের উজ্জ্বল উদাহরণ।

→ রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোর উপর আস্থার সংকট তৈরি হয়।

প্রশাসনিক দুর্বলতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মারাত্মক অভাব এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতি প্রশাসনকে জনগণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রশাসন যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তখন জনগণ ন্যায়বিচার ও ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা ক্ষোভের জন্ম দেয়।

→ আমলাতন্ত্রে নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার অভাব উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদের অসম বণ্টন

শহর ও গ্রামের মধ্যকার বৈষম্য, মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া এবং সীমাহীন বেকারত্ব সামাজিক ক্ষোভের সঞ্চার করে। বঞ্চিত শ্রেণী যখন নিজেকে রাষ্ট্রের বাইরে মনে করে, তখন সংহতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

→ বৈষম্যমূলক অর্থনীতি সামাজিক সম্প্রীতির প্রধান শত্রু।

সামাজিক ও শ্রেণী বৈষম্য

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকারের অস্বীকৃতি ও বঞ্চনা দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্ষোভ তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫-পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতা (যা ১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে কিছুটা কমে)।

→ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যতীত ঐক্য কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শিক্ষার অভাব

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বারবার দুর্বল করে দেয়।

- **১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়:** তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম উদাসীনতা বাঙালির জাতীয় সংগ্রামকে তরান্বিত করে।
- **১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও ১৯৯৮ সালের বন্যা:** অর্থনীতি এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর অপূরণীয় ক্ষতি করে।

শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার অভাব

মানসম্মত ও সমতাভিত্তিক শিক্ষার অভাব সমাজে কুসংস্কার এবং অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে। অশিক্ষিত ও অসচেতন নাগরিকরা সহজেই নানা অপপ্রচার ও গুজবে বিভ্রান্ত হয়, যা সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে।

বড় দুর্যোগের প্রভাব কালক্রম

১৯৭০
ঘূর্ণিঝড় ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন গতি পায়

১৯৯১
প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়

১৯৯৮
ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ও অর্থনৈতিক ধাক্কা

জাতি গঠন ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

ইতিহাস, অর্জন ও বর্তমান বাস্তবতার চিত্র

মূল ভিত্তি

বাংলাদেশের জাতিসত্তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল।

- ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ
- ১৯৭২ সালের মূল ধর্মনিরপেক্ষ ও সমতাভিত্তিক সংবিধান
- অভিন্ন বাংলা ভাষা ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য

বর্তমান চ্যালেঞ্জ

স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দী পরেও কিছু অমীমাংসিত বৈষম্য ও সংকট রয়ে গেছে।

- চরম অর্থনৈতিক ও ধনী-দরিদ্র বৈষম্য
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তির অভাব
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ না হওয়া
- রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সহনশীলতার অভাব

উল্লেখযোগ্য অর্জন

নানা সংকটের মধ্যেও এ দেশের জনগণ অভাবনীয় অগ্রগতি দেখিয়েছে।

- নারী শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসার ও সামাজিক ক্ষমতায়ন
- যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি (যেমন: পদ্মা সেতু)
- খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃষির টেকসই উন্নয়ন
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচক ইমেজ বৃদ্ধি

বাস্তবতা: বাংলাদেশের জাতি গঠনের বীজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাঝে প্রোথিত থাকলেও, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার ছাড়া তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জাতীয় বিকাশ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় দীর্ঘ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের এক কালজয়ী ইতিহাস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে শুরু করে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি একটি স্বাধীন জাতির সত্ত্বা লাভ করে।

১৯৪৭
ব্রিটিশ বিদায় ও পাকিস্তান সৃষ্টি

১৯৫২
মহান ভাষা আন্দোলন ও রক্তের শপথ

১৯৬৬
বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সনদ ৬-দফা দাবি

১৯৭০
নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়

১৯৭১
সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ

শিক্ষা: ভাষা আন্দোলন, ৬-দফা এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ—এই তিনটি মাইলফলকই হলো এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর।

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

যুদ্ধোত্তর ভঙ্গুর অবস্থা থেকে আজকের অগ্রগতির বিবরণ

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্জন ও সাফল্য	দীর্ঘমেয়াদি অমীমাংসিত চ্যালেঞ্জসমূহ
১৯৭২ সালের আধুনিক সংবিধান: ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন।	**রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক অভ্যুত্থান:** গণতান্ত্রিক বিকাশকে বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে।
শিক্ষার সামাজিক সম্প্রসারণ: সাক্ষরতার হারের অভূতপূর্ব উন্নতি ও সচেতনতা।	**অর্থনৈতিক বৈষম্য:** ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।
নারী শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন: কর্মক্ষেত্রে নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।	**দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা:** সুশাসন ও প্রশাসনের উপর জনগণের আস্থার সংকট।

মুক্তিযুদ্ধের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে গণতন্ত্র, সুশাসন ও ন্যায়বিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া আবশ্যক।

সাংস্কৃতিক বহুত্ব, বৈশ্বিক প্রভাব ও সামাজিক শক্তি

সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ

বাঙালি সংস্কৃতির পাশাপাশি চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতালসহ প্রায় অর্ধশতাধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাদের অধিকারের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্ব জাতীয় সংহতিকে সমৃদ্ধ করে।

→ বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি।

বৈশ্বিক প্রভাব ও প্রবাসী

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভকে সচল রেখেছে। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য, সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বাংলাদেশের জোরালো কণ্ঠস্বর বিশ্বজুড়ে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে।

→ রেমিট্যান্স এদেশের অর্থনীতির রক্ষাকবচ।

অপ্রতিরোধ্য সামাজিক শক্তি

এদেশের অদম্য যুবসমাজ, কঠোর পরিশ্রমী সামাজিক নারী শক্তি এবং বিশাল কর্মজীবী শ্রেণী দেশের অগ্রযাত্রার প্রধান চালিকাশক্তি। শিক্ষার আধুনিকায়ন ও দক্ষ প্রশিক্ষণ এই বিশাল মানবসম্পদকে সম্পদে রূপান্তর করছে।

→ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা যুব শক্তির অপার সম্ভাবনা।

মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

★ মুক্তিযুদ্ধের চিরন্তন উত্তরাধিকার

মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি ভূখণ্ড অর্জনের সংগ্রাম ছিল না; এটি ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার এবং অসাম্য দূরীকরণের পরম আদর্শ। এই উত্তরাধিকারকে টিকিয়ে রাখতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাসচর্চায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

- ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সার্বক্ষণিক চর্চা।
- জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ স্মৃতির যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা।
- পাঠ্যক্রমে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তি-ইতিহাসের নির্মোহ অন্তর্ভুক্তি।

⚖ সুশাসন ও গণতান্ত্রিক কাঠামো

শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া গণতন্ত্র কখনো টেকসই হতে পারে না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও জনগণের দূরত্ব ঘুচানো সম্ভব।

- **আইনের শাসন:** সকলের জন্য ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।
- **স্থানীয় সরকার:** তৃণমূলের প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতা নিশ্চিত করা।
- **জবাবদিহিতা:** প্রশাসনের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ।

📢 মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, সমতা, মানবাধিকার ও আইনের সুদৃঢ় শাসনই একটি দীর্ঘস্থায়ী ও সুখী জাতি গঠনের অন্যতম বীজমন্ত্র।

জাতি গঠনে জিয়াউর রহমানের পদক্ষেপ :

প্রশাসনিক সংস্কার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

প্রশাসনিক পুনর্গঠন: ১৯৭৬ সালে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জিয়াউর রহমান সরকারি প্রশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর উদ্যোগ নেন।

নির্বাচনী ব্যবস্থা: ১৯৭৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৭৭% ভোট পেয়ে এবং ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, যা দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

বহুদলীয় গণতন্ত্র: ১৯৭৬ সালে বাকশাল বাতিল করে তিনি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম পুনরায় চালুর অনুমতি দেন এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতি গঠনে জিয়াউর রহমানের পদক্ষেপ :

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন

১৯-দফা কর্মসূচি: ১৯৭৭ সালে ঘোষিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

শিল্প ও বিনিয়োগ: জাতীয়করণকৃত শিল্প খাতের বেসরকারীকরণ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ চালু এবং বিনিয়োগ নীতিমালা সংস্কারের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

পোশাক শিল্পের সূচনা: ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের রেডি-মেড গার্মেন্টস (RMG) শিল্পের বিকাশে ভিত্তি স্থাপন করেন।

স্থানীয় উন্নয়ন: গ্রামীণ প্রশাসনিক কার্যক্রমের উন্নতির লক্ষ্যে তিনি 'গ্রাম সরকার' প্রথা চালু করেন।

জাতি গঠনে জিয়াউর রহমানের পদক্ষেপ :

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি

- **শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম:** শিক্ষার প্রসারে ১৯৭৯ সালে ৫০০টিরও বেশি নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পাঠ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **সামাজিক উন্নয়ন:** নারী ও শিশুদের কল্যাণে তিনি কাজ করেন' এবং 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন।
- **কূটনৈতিক সাফল্য:** তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে যথাক্রমে চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রদান করে।
- **আন্তর্জাতিক অবস্থান:** ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ তার নেতৃত্বেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়, যা দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

- **রাজনৈতিক ও জাতীয় আদর্শ:** ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের মাধ্যমে জাতিকে অনুপ্রাণিত করেন এবং 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও আত্মপরিচয় সুসংহত করেন।
- **গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা:** বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেন এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।
- **অর্থনৈতিক ও কৃষি উন্নয়ন:** 'খাল কাটা কর্মসূচি'র মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটান এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রসারে বেসরকারি খাত ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেন।
- **পররাষ্ট্র ও শিক্ষা:** বাস্তবমুখী পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

- **গণসংহতি ও প্রেক্ষাপট:** ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক সচেতনতা ও নাগরিক অংশগ্রহণের ভিত্তি স্থাপন করে।
- **অস্থিরতার প্রভাব:** প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক বিভাজন দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা সৃষ্টি করে।
- **গণঅভ্যুত্থান:** এটি শুধু ক্ষমতা দখলের সমস্যা নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও নৈতিক চেতনার প্রতিফলন।
- **রাষ্ট্রীয় কার্যকারিতা:** দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতা রাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং নাগরিক আস্থা ক্ষুণ্ণ করে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সংজ্ঞা

- **মূল ধারণা:** প্রশাসনিক কার্যকারিতা, নীতি প্রয়োগ এবং ক্ষমতার বিতরণ জনগণের আস্থার সাথে সমন্বিত না থাকাই হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।
- **বহুমাত্রিক প্রভাব:** এটি সরকারি কার্যকারিতা হ্রাস, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।
- **সম্পর্কিত বিষয়সমূহ:** প্রশাসনিক দুর্বলতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সংবিধান বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং সামাজিক অসাম্য এর প্রধান কারণ।
- **মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব:** প্রশাসনিক কাঠামো ধ্বংস ও অদক্ষতা থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থান এই অস্থিতিশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **বিভাজন ও সংকট:** মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের সংকট, জাসদ গঠন ও সিরাজ শিকদার হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণ ছিল।
- **একদলীয় শাসন:** ১৯৭৫ সালের বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও সেনাশাসনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ রাজনৈতিক সহনশীলতা হ্রাস করে।
- **দ্বিদলীয় গণতন্ত্র:** ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা এবং বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মাধ্যমে দ্বিদলীয় দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রসার ঘটে।
- **নির্বাচন ও বৈষম্য:** নির্বাচনি বৈধতার সংকট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট আধুনিক রাজনীতির অস্থিতিশীলতার মূল বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ

- **ক্ষমতা ও প্রশাসন:** ক্ষমতার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বল প্রশাসনের কারণে নীতি বাস্তবায়নে পক্ষপাত সৃষ্টি হয়।
- **রাজনৈতিক ও বিচারিক দ্বন্দ্ব:** রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার অভাব অচলাবস্থা তৈরি করে।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য:** সম্পদের অসম বণ্টন এবং সংখ্যালঘু ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতি অবহেলা অসন্তোষ বাড়ায়।
- **নির্বাচন ও শিক্ষাঙ্গন:** নির্বাচন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা এবং শিক্ষাঙ্গন ও যুবসমাজের রাজনৈতিক উত্তেজনা অস্থিতিশীলতাকে তীব্রতর করে।

অস্থিতিশীলতা নিরূপণের উপায়

ক্ষমতা: ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া: নির্বাচনি স্বচ্ছতা রক্ষা ও সংলাপের সংস্কৃতি।

সহনশীলতা: রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সামাজিক সংহতির বিকাশ।

অন্তর্ভুক্তি: যুবসমাজের অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা।

গণমাধ্যম: গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখা।

গণঅভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

সংজ্ঞা: 'গণঅভ্যুত্থান' হলো জনগণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ও আকস্মিক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার একটি প্রক্রিয়া।

অভ্যুত্থান বনাম গণঅভ্যুত্থান: অভ্যুত্থান সাধারণত গোষ্ঠী বা সেনাবাহিনী দ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া, আর গণঅভ্যুত্থান হলো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রতিফলন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের ইতিহাস গণঅভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস (১৯৬৯, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর অভ্যুত্থান এর প্রধান উদাহরণ)।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

মূল কারণ: রাজনৈতিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র: ছাত্রসমাজ (১১-দফা দাবির মাধ্যমে), সাথে শ্রমিক, কৃষক ও পেশাজীবী শ্রেণির অংশগ্রহণ।

ফলাফল ও গুরুত্ব: শেখ মুজিবসহ নেতাদের মুক্তি, আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের পতন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে এই আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি তৈরি করে।

১৯৭৬-১৯৮০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন

পটভূমি: শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসন এবং রাজনৈতিক শূন্যতা।

আন্দোলনের রূপ: ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সমাজের সমন্বয়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রতিরোধ।

ফলাফল: সামরিক শাসনের নীতি পরিবর্তনে জনমতের চাপ তৈরি করা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করা। এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারার ধারাবাহিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান

মূল কারণ: এরশাদের দীর্ঘ সামরিক শাসন, নির্বাচনি কারচুপি, দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন।

ঘটনাপ্রবাহ: বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও 'অল পার্টি স্টুডেন্ট সংগ্রাম পরিষদ'-এর যৌথ আন্দোলন এবং নূর হোসেনের আত্মত্যাগ।

ফলাফল: ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পদত্যাগ, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

পটভূমি: সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি, স্বৈরাচারী শাসন, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ।

ঘটনাপ্রবাহ: ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে আবু সাইদ নিহত হওয়ার পর আন্দোলন তীব্রতর হয়; ৫ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটে।

ফলাফল ও গুরুত্ব: স্বৈরাচারের অবসান এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের নতুন পথ উন্মোচন। এটি যুবশক্তির রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন এবং ডিজিটাল যুগের প্রথম বড় আন্দোলন হিসেবে পরিচিত।

এরশাদের ক্ষমতা দখল ও সামরিক শাসনের সূচনা (১৯৮২)

- **ক্ষমতা দখল ও অভ্যুত্থান :** ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তৎকালীন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে অপসারিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন।

- **সামরিক আইনের প্রয়োগ ও কঠোর শাসন :** দেশের সংবিধান স্থগিত ও সকল রাজনৈতিক সভা-সমিতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এরশাদ নিজেকে দেশের 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' ঘোষণা করেন।

- **বিতর্কিত গণভোট ও বৈধতার চেষ্টা :** সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রেখে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ একটি বিতর্কিত গণভোটের আয়োজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে শাসনের বৈধতা অর্জনের চেষ্টা চলে।

বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয়তা

ছাত্র আন্দোলনের উত্থান

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ হিসেবে 'ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এটিই ছিল আন্দোলনের মূল শক্তির প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ

১৯৮৩ সালের মে-জুন মাসে রাজপথের প্রধান দলগুলো সম্পৃক্ত হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়।

আন্দোলনের দেশব্যাপী প্রসার

পেশাজীবী সংগঠনগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আন্দোলন দ্রুত গতিতে ঢাকা থেকে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন জোটের গঠন ও রাজনৈতিক ঐক্য

১৫-দলীয় জোট

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমন্বয়

১৯৮৩ সালের ১ ডিসেম্বর গঠিত এই বৃহৎ জোট গণসংযোগ বৃদ্ধি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ৫ দফা দাবিতে আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে নেয়।

৭-দলীয় জোট

বিএনপির নেতৃত্বে প্রতিরোধ

১৯৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি গঠিত এই জোট সামরিক সরকারের অধীনে সকল নির্বাচন বয়কটের কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করে শাসনের বৈধতাকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।

৫-দলীয় জোট

বামপন্থি দলগুলোর সক্রিয়তা

১৯৮৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গঠিত এই বামপন্থি জোট অর্থনৈতিক অসমতা দূরীকরণ এবং শ্রমিক-কৃষকদের অধিকার আদায়ের দাবিকে আন্দোলনের অন্যতম মূল এজেন্ডা করে তোলে।

ত্রিজোটের ঐক্য

ঐতিহাসিক যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৫ সালের জুন মাস থেকে এই তিনটি প্রধান রাজনৈতিক জোটের পারস্পরিক দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত সহযোগিতা ও সমঝোতা আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দিতে সহায়তা করে।

আন্দোলনের বিস্তার ও সরকারি দমননীতি

১৯৮৬

সংসদ নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা

- **নির্বাচনি কারচুপি ও বিরোধী দলের পদত্যাগ** ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন কারচুপির প্রতিবাদে এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী দলগুলো সংসদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করে।
- **কঠোর দমননীতি ও সরকারি বলপ্রয়োগ** স্বৈরাচারী সরকার দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি, রাজপথে মিছিল নিষিদ্ধকরণ এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আন্দোলন দমনের চরম চেষ্টা চালায়।
- **অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ ও সামরিক অসন্তোষ** পুলিশি ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সত্ত্বেও আপামর জনসাধারণের তীব্র প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে এবং সেনাবাহিনীর ভেতরেও এরশাদবিরোধী স্পষ্ট অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ, প্রস্তুতি ও বিজয়

১৯৮৭

১০ নভেম্বর নূর হোসেনের বীরত্বপূর্ণ শাহাদাতবরণ আন্দোলনকে স্ফুলিঙ্গের মতো তীব্রতর করে তোলে।

১৯৮৮

রাজনৈতিক প্রতিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় এবং স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি পুরোপুরি নড়বড়ে হয়ে যায়।

১৯৯০

সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের যৌথ ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য রূপ লাভ করে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯০

সেনাবাহিনী সমর্থন প্রত্যাহার করায় এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯০ সালের এরশাদবিরোধী গণআন্দোলন

- **প্রেক্ষাপট:** ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের ক্ষমতা দখল এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়।
- **আন্দোলনের সূচনা:** ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর দেশব্যাপী হরতালের মাধ্যমে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা নাজিরুদ্দিন জেহাদের মৃত্যু আন্দোলনকে তীব্রতর করে।
- **ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস:** বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী জোট ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে যৌথ ঘোষণাপত্রে এরশাদের পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং ৯০ দিনের মধ্যে অবাধ নির্বাচনের দাবি জানায়।
- **ফলাফল:** ২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর সংঘর্ষে ৫০ জনের বেশি নিহত হওয়ার পর, ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন: এরশাদের পদত্যাগের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, যা নির্বাচনকালীন প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখে।

সাধারণ নির্বাচন: ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট ৫৫.৪৫% ভোটার উপস্থিতি ছিল।

সরকার গঠন: নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গঠন করে।

সাংবিধানিক পরিবর্তন: ১৯৯১ সালের আগস্টে সংবিধানের ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমিত করা হয়।

১৯৯৪-১৯৯৬ সালের নির্বাচনি অনিয়ম ও আন্দোলন

- **কারচুপির অভিযোগ:** ১৯৯৪ সালের মার্চে মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে বিরোধী দলগুলো (আওয়ামী লীগ, জাপা ও জামায়াত) নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে।

- **আন্দোলন ও কর্মসূচি:** বিরোধী দলগুলো সংসদ বয়কট এবং সরকারের পদত্যাগের দাবিতে তীব্র হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করে, যা জনজীবন ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

- **ফেব্রুয়ারি নির্বাচন:** ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়নি, যেখানে ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ২১%।

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি

প্রয়োজনীয়তা:

নির্বাচনকালীন প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখা, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব হ্রাস এবং ভোটারদের আস্থা নিশ্চিত করতে এই ব্যবস্থার অবতারণা হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনী:

সংবিধানের ৫৮(খ) থেকে ৫৮(ঙ) অনুচ্ছেদ যোগ করে এই ব্যবস্থার আইনি ভিত্তি তৈরি করা হয়।

গঠনতন্ত্র:

সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁর অধীনে ১০ জন উপদেষ্টা সরকার পরিচালনা করতেন।

কার্যকারিতা:

এই ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

বেগম খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্ব

- **রাজনৈতিক দৃঢ়তা:** বেগম খালেদা জিয়া সবসময় দেশের মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সংকটের সময় আপসহীন নেতৃত্বের মাধ্যমে দলের নির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
- **দলীয় ঐক্য:** দলের বিভিন্ন মতপার্থক্য সত্ত্বেও তিনি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা তৈরির মাধ্যমে দলের ঐক্য অটুট রেখেছেন।
- **জনসেবার প্রতিশ্রুতি:** জনগণের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, যা তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।
- **নীতি ও আদর্শ:** রাজনৈতিক সমঝোতার বিভিন্ন প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনোই নিজের নীতির সাথে আপস করেননি, যা তাঁকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতার মর্যাদা দিয়েছে।

২০০৭-২০০৮ সালে সামরিক-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

- **জরুরি অবস্থা:** ২০০৬ সালের শেষের দিকে রাজনৈতিক সহিংসতা ও ভোটার তালিকা নিয়ে জটিলতার কারণে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়।
- **সরকার গঠন:** সামরিক বাহিনীর সমর্থনে সাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- **দুর্নীতি দমন অভিযান:** সরকারের প্রধান লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল দুর্নীতি দমন, যার আওতায় দুই প্রধান দলের শীর্ষ নেতা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।
- **২০০৮ নির্বাচন:** ডিসেম্বর ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়, তবে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার বিলুপ্তি

- **পঞ্চদশ সংশোধনী:** ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে এই সংশোধনী পাসের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়।
- **আইনি প্রেক্ষাপট:** ১০ মে ২০১১ তারিখে আপিল বিভাগের সাত বিচারকের বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে।
- **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** ব্যবস্থার বিলুপ্তির প্রতিবাদে বিএনপি ও জামায়াতসহ বিভিন্ন দল হরতালের ডাক দেয়, যা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।
- **ভবিষ্যৎ অবস্থান:** হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী, ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব সংসদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

২০১৪ সালের একদলীয় নির্বাচন

নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি: বিএনপি ও জোট শরিকরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানালে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে, যার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবরোধের সৃষ্টি হয়।

নির্বাচন ও ফলাফল: নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টিতে আওয়ামী লীগ ও শরিকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় এবং ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ৩৯.৫৮%।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: অংশগ্রহণমূলক না হওয়ায় জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।

২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচন

নির্বাচনপূর্ব অস্থিরতা: নিরপেক্ষ সরকারের দাবির প্রেক্ষিতে বিএনপি ও জোটের অবরোধ কর্মসূচিতে সারাদেশে সহিংসতার সৃষ্টি হয়।

নির্বাচনী ফলাফল: মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২২৪টি আসনে আওয়ামী লীগ ও শরিকরা বিজয়ী হয় এবং ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১.৮%।

তথ্যবিভ্রাট: নির্বাচন কমিশন প্রথমে ২৭.১৫% ভোট পড়ার তথ্য দিলেও পরে তা ৪০% ছাড়িয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়, যা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

বিতর্ক: আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো নির্বাচনের পূর্ববর্তী সহিংসতা ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান

- **সূত্রপাত ও দাবি:** ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে উদ্ভূত ২০২৪ সালের ৫ জুন শুরু হওয়া আন্দোলনটি পরবর্তীতে সরকারের পদত্যাগ ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে রূপ নেয়।
- **সহিংসতা ও প্রাণহানি:** সরকারি হিসেবে ৮৩৪ জন নিহত হলেও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি।
- **সরকারের পতন:** আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট ২০২৪ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়।
- **সাংস্কৃতিক প্রতিফলন:** এই আন্দোলন 'জেনারেশন জেড আন্দোলন' হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায় এবং বিভিন্ন ডকুমেন্টারি ও উৎসবের মাধ্যমে ইতিহাসটি সংরক্ষিত হচ্ছে।

২০২৪ সালের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন

- **সূচনা:** কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে উদ্ভূত 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান' বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনা।
- **আন্দোলনের রূপান্তর:** কোটা সংস্কারের বৈষম্যবিরোধী দাবি থেকে সরকারের দমননীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে এটি স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়।
- **প্রাণহানি:** হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্যমতে, জুলাই মাসে সরকারি দমন-পীড়নে অন্তত ১,৪০০ জন নিহত হয়, যাদের মধ্যে প্রায় ১২-১৩% শিশু ছিল।
- **সাফল্য:** ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়।

২০২৪ সালের শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন

- **ঐতিহাসিক ভিত্তি:** ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৯ ধারা অনুযায়ী সমতা ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার ছিল।
- **কোটাব্যবস্থার বিবর্তন:** মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০% কোটা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে তাদের সন্তান ও নাতিপুতিদের কোটা সুবিধা প্রদান সরকারি চাকরির নিয়োগ কাঠামোতে অসন্তোষ তৈরি করে।
- **প্রথম পর্যায় (২০১৮):** কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, ছাত্র অধিকার পরিষদ গঠন এবং ছাত্রলীগের আক্রমণের মুখে প্রধানমন্ত্রীর কোটা বাতিলের ঘোষণা ও প্রজ্ঞাপন জারি।
- **দ্বিতীয় পর্যায় (২০২৪):** হাইকোর্ট বিভাগ ২০১৮ সালের কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপন স্থগিত করলে শিক্ষার্থীদের নতুন করে আন্দোলন ও সুনির্দিষ্ট ৫ দফা দাবির উত্থাপন।
- **লং মার্চ ও বিজয়:** ৫ আগস্ট 'লং মার্চ টু গণভবন' কর্মসূচি, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ এবং শেখ হাসিনার পদত্যাগের মাধ্যমে আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়।

২০২৪ সালের রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন

- **কোটা সংস্কারের রাজনৈতিক রূপ:** ৫৬% কোটার অন্যায্যতা ও ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর 'রাজাকার' মন্তব্যের পর আন্দোলন তীব্র রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে।
- **বাংলা ব্লকেড:** ৭ জুলাই শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে সারাদেশে রাজপথ ও রেল অবরোধের মাধ্যমে সরকারের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হয়।
- **বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন:** ১৬ জুলাই আবু সাঈদের মৃত্যুর পর ৬৫ সদস্যের কমিটি গঠন এবং শেখ হাসিনার পদত্যাগসহ নয়দফা দাবি পেশ করা হয়।
- **অসহযোগ আন্দোলন:** ৩ আগস্ট থেকে কর, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল প্রদান বন্ধের আহ্বানের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনিক ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেওয়া হয়।
- **ক্ষমতার রদবদল:** ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ।

২০২৪ সালের সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন

- **গ্রাফিতি ও দেওয়াল লিখন:** "জুলাই বিপ্লব" ও "অন্ধকারের মিছিল" স্লোগান সংবলিত গ্রাফিতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, যা সাধারণ জনগণকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে।
- **March for Unity:** ২ আগস্ট ঢাকায় প্রায় ৫ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই মিছিল সামাজিক সংহতির প্রতীক হয়ে ওঠে।
- **মানবিক চেতনা:** নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের মাধ্যমে আন্দোলনটি মানবাধিকারকেন্দ্রিক গভীর আবেগঘন রূপ লাভ করে।
- **বৈশ্বিক সংহতি:** তরুণরা গাজা গণহত্যার বিরুদ্ধে সমাবেশ করে নিজেদের বিশ্বজনীন মানবাধিকার চেতনার সাথে যুক্ত করে।
- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ:** রাজনৈতিক কর্মসূচি ক্ষমতা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে, আর সামাজিক কর্মসূচি জনগণের মধ্যে ঐক্য ও দীর্ঘমেয়াদি ন্যায়বিচারের ভিত্তি তৈরি করেছে।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ

- **কোটা সংস্কারের দাবি:** ২০১৮ সালের কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণার পর মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা।
- **সরকারি দমন-পীড়ন:** পুলিশ ও ছাত্র সংগঠনের সহিংস হামলায় নিহত ও আহতদের ঘটনায় জনগণের মাঝে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভের সঞ্চার।
- **নির্বাচনি অবিচার:** দীর্ঘদিনের নির্বাচনি কারচুপির অভিযোগ ও বিরোধী দল দমনের কারণে জনমনে সৃষ্টি হওয়া আস্থাহীনতা।
- **মতপ্রকাশের নিয়ন্ত্রণ:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সেন্সরশিপের মাধ্যমে বাক্‌স্বাধীনতা হরণ এবং সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের হয়রানি।
- **অর্থনৈতিক সংকট:** উচ্চ বেকারত্ব, সরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত হওয়া এবং নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চরম অবনতি।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল

- **রাজনৈতিক পরিবর্তন:** ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ও রাজনৈতিক জবাবদিহিতার দাবি জোরালো হওয়া।
- **সংস্কার কমিশন:** প্রশাসন, নির্বাচন ও বিচারব্যবস্থার ন্যায়নিষ্ঠ পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠনের উদ্যোগ।
- **তরুণদের স্বীকৃতি:** নীতিনির্ধারণে তরুণ ও ছাত্রসমাজের কণ্ঠস্বরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হওয়া।
- **নাগরিক সচেতনতা:** অধিকার ও রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া।
- **প্রশাসনিক পুনর্মূল্যায়ন:** জনবান্ধব প্রশাসন এবং দুর্নীতি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত হওয়া।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

- **সামাজিক প্রেক্ষাপট:** ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, শিক্ষিত বেকারত্ব, ন্যায়বিচারের সংকট এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়।
- **তরুণদের ভূমিকা:** ছাত্রসমাজ ও তরুণ প্রজন্মের সংগঠিত অংশগ্রহণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব।
- **গণতান্ত্রিক চর্চার সংকট:** অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির অনুপস্থিতি, নির্বাচনের আস্থাহীনতা ও বিরোধী মত দমনের প্রতিকূল পরিবেশ।
- **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ:** ক্ষমতা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকা এবং নীতিনির্ধারণে প্রান্তিক কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করা।
- **প্রশাসনের রাজনীতিকরণ:** সরকারি প্রশাসনে দলীয় প্রভাব ও নিরপেক্ষতার অভাব জনমনে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভিত্তি তৈরি করে।

কোটা আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান একটি বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন: একটি ছোট কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলাদেশে বিরল, যা মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিদ্যমান গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ।

বেকারত্বের প্রভাব: সরকারি চাকরির আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার কারণে এটি মেধাবী শিক্ষার্থীদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর কোটা ব্যবস্থা তাদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করায় প্রবল ক্ষোভের জন্ম দেয়।

জনতুষ্টিবাদের রাজনীতি: সরকারি দল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে কোটা ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করে, যা শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল।

শাসন ব্যবস্থার সংকট: সরকার দলীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এবং বিরোধীদের দমন করায় গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়ে, যা শিক্ষার্থীদের বিদ্রোহে বাধ্য করে।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীসমাজের ভূমিকা

ব্যাপক অংশগ্রহণ: আন্দোলনে প্রায় ৬০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ছিলেন নারী, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

টার্নিংপয়েন্ট: ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের গেট ভেঙে নারীদের রাস্তায় নামা আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দেয়।

নেতৃত্ব ও সংগঠন: উমামা ফাতেমা, শাহিনূর সুমি ও নুসরাত তাবাসসুমের মতো নারী শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সাহসিকতা ও প্রতিরোধ: ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলার মুখেও নারীরা লাঠি-পাথর নিয়ে লড়েছেন এবং আহতদের সেবা ও গ্রাফিতি আঁকার মাধ্যমে আন্দোলনকে সচল রেখেছেন।

২০২৪ জুলাই আন্দোলনে মিডিয়ার ভূমিকা

- **আন্তর্জাতিক কভারেজ:** বিসিসি, আলজাজিরা ও সিএনএন-এর মতো প্রভাবশালী বিশ্ব গণমাধ্যম আন্দোলনের গুরুত্ব ও রাজনৈতিক চালচিত্র বিশ্ববাসীর নজরে আনে।
- **সোশ্যাল মিডিয়া:** ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মূলধারার বাইরে গিয়ে আন্দোলনের বিস্তারিত তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
- **জাতিসংঘ ও ফোরামসমূহ:** জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি প্রচার করে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে।
- **প্রবাসী ও শ্রমিকদের সংহতি:** বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালিরা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ শ্রমিকশ্রেণিও প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে সংহতি প্রকাশ করে।
- **বৈশ্বিক জনমত গঠন:** অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

অরাজনৈতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হিসেবে জুলাই গণঅভ্যুত্থান

- **ছাত্র-নেতৃত্ব:** কোনো দলীয় নির্দেশনা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে আন্দোলনটি শুরু হয় এবং পরিচালিত হয়।
- **দাবি ও চেতনা:** আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল কোটা সংস্কার, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার, যা কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডার সাথে সম্পর্কিত ছিল না।
- **সোশ্যাল মিডিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা:** কোটা রিফর্ম মুভমেন্ট হ্যাশট্যাগে ১০ মিলিয়নের বেশি ইন্টারঅ্যাকশন প্রমাণ করে যে আন্দোলনটি জনস্বতঃস্ফূর্ত ছিল।
- **রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি:** আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিএনপি বা জামায়াতের মতো দলগুলোর সম্পৃক্ততা ছিল না, যা একে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখে।
- **জনগণের জাগরণ:** কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় এটি একটি গণমুখী ও মানবিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব

- ✓ **Bottom-up রাজনৈতিক সংস্কৃতি:** জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় হওয়ায় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তৃণমূলের গুরুত্ব নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ✓ **দলীয় প্রভাবমুক্ত উদ্যোগ:** রাজনৈতিক দলের প্রভাব ছাড়াই যে পরিবর্তন আনা সম্ভব, তা প্রমাণিত হওয়ায় জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ **ডিজিটাল অংশগ্রহণ:** সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও ডিজিটাল অংশগ্রহণের একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।
- ✓ **জবাবদিহিতার দাবি:** গণঅভ্যুত্থান সরকারের জবাবদিহিতা ও নৈতিকতার গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রশাসনিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত করেছে।
- ✓ **ক্ষমতার পুনর্বণ্টন:** ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ভেঙে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজনৈতিক ধারায় এক বড় পরিবর্তন এনেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর গণঅভ্যুত্থান হিসেবে ১৯৯০ ও ২০২৪ সাল বিশ্লেষণ

- **উদ্দীপক কারণ:** ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল মূল কারণ, আর ২০২৪ সালে কোটা বৈষম্য থেকে শুরু হয়ে তা কর্তৃত্ববাদবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।
- **নেতৃত্বের ধরণ:** ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল প্রধান, কিন্তু ২০২৪ সালে বিকেন্দ্রীভূত ছাত্র নেতৃত্ব ও সমন্বয়করা মূল ভূমিকা পালন করে।
- **প্রযুক্তির প্রভাব:** ১৯৯০ সালে লিফলেট ও সংবাদপত্র ছিল প্রধান মাধ্যম, বিপরীতে ২০২৪ সালে ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটক আন্দোলনকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।
- **নারী ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ:** ২০২৪ সালে নারীদের অংশগ্রহণ ১৯৯০ সালের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যমান ও নির্ণায়ক ছিল।
- **গণতন্ত্রের শিক্ষা:** উভয় আন্দোলনই প্রমাণ করেছে যে জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে স্বৈরশাসন টিকে থাকতে পারে না, তবে ২০২৪ সাল আধুনিক প্রযুক্তি ও তরুণ নেতৃত্বের নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

২০২৪ সালের গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে সংস্কার কার্যক্রম

- **১১টি কমিশন গঠন:** অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সেক্টরে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করে।
- **কমিশনগুলোর ক্ষেত্র:** সাংবিধানিক কাঠামো, জনপ্রশাসন, নির্বাচন ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার, পুলিশ, গণমাধ্যম, দুদক, বিচার বিভাগ, শ্রম অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব।
- **সাংবিধানিক সংস্কার:** ড. আলী রিয়াজের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন প্রস্তাবনা পুনর্লিখন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ চার বছর এবং ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের সুপারিশ করে।
- **জনপ্রশাসন ও নির্বাচন ব্যবস্থা:** জনপ্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা, উপ-সচিব নিয়োগে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি এবং নির্বাচনে 'না' ভোটের বিধানসহ মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতির প্রস্তাব।
- **প্রতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা:** পুলিশ, দুদক এবং বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য পৃথক কমিশন বা সচিবালয় গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।
- **বাস্তবায়নের শর্ত:** এই সংস্কারগুলোর সফলতা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় ঐকমত্য এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

জুলাই ঘোষণাপত্র

- **ঐতিহাসিক দলিল:** ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক ঘোষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দলিল।
- **মূল উদ্দেশ্য:** জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা।
- **২৮টি দফা:** ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতার সংগ্রাম, গত ১৬ বছরের দুঃশাসন, গুম-খুন, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং জুলাই আন্দোলনের শহীদদের আত্মত্যাগের বিবরণ রয়েছে।
- **অঙ্গীকার:** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন, মানবাধিকার সুরক্ষা, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র গঠন এবং শহীদদের জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃতির দাবি ব্যক্ত করা হয়েছে।
- **রাষ্ট্রীয় রূপান্তর:** এই দলিলটি বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ এবং পরবর্তী নির্বাচনে সংস্কারকৃত সংবিধানের অধীনে গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

জুলাই সনদ

- **জাতীয় ঐকমত্য:** রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের রূপরেখা তৈরির জন্য ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় ঐকমত্য কমিশন' গঠন করা হয়।
- **১৭ অক্টোবর ২০২৫:** ২৫টি রাজনৈতিক দল ও ঐকমত্য কমিশনের সম্মতিতে স্বাক্ষরিত হয় 'জুলাই জাতীয় সনদ', যা পরবর্তীতে ১৩ নভেম্বর ২০২৫ অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়।
- **তিনটি ভাগ:** পটভূমি (গণঅভ্যুত্থানের চেতনা), সংস্কার প্রস্তাব ও ঐকমত্য (৮৪টি প্রস্তাব), এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার (সরকার গঠনের পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে)।
- **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:** ১. আইনি আদেশ জারি (গেজেট), ২. গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি গ্রহণ, ৩. সংসদীয় প্রক্রিয়ায় সংবিধান সংশোধন ও আইন প্রণয়ন।
- **লক্ষ্য:** আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার যেন এই ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধ্য থাকে, তা নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনা।